শ্রীগৌরসুন্দরের পঞ্চশত-বর্ষপূর্তি আবির্ভাব উৎসব অবসরে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

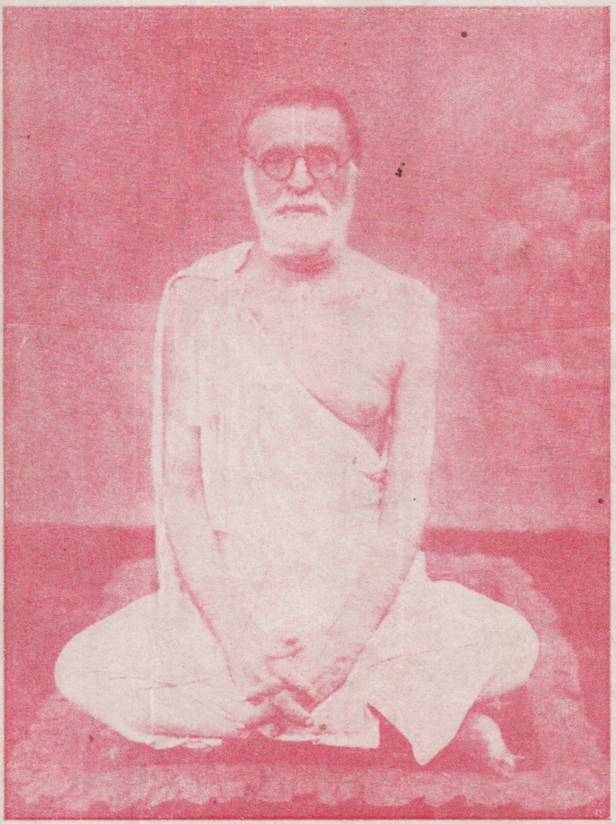

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঔদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পঞ্চশত-আবির্ভাব উৎসব
উপলক্ষে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

(শুদ্ধভক্তি বিষয়ক অপূর্ব শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ চিত্তাকর্ষক
প্রবন্ধ-কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ)

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী প্রভুপাদের
সর্বনিকৃষ্ট কনিষ্ঠ শিষ্যাধম—
শিক্ষাগুরু
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ**
ও
প্রকটাচার্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের**
কৃপাকণ প্রার্থী সেবকাধম

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ

কর্ত্তৃক লিখিত

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) কর্ত্তৃক *প্রকাশিত*।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা
SREE BHAKTISIDDHANTA
RATNAMALA

প্রথম সংস্করণ :
৪ই জানুয়ারী ১৯৮৬
২০শে পৌষ ১৩৯২
শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের
(৯০) তম বর্ষপূর্তি প্রাকট্য মহোৎসব

প্রকাশক :
শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ

মুদ্রণালয় :
শ্রীভাগবত প্রেস
বাগবাজার,
কলিকাতা।

ভূমিকা

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপম্।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্॥
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাসাম্।
প্রাপ্তযস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরু তং নতোঽস্মি॥
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় সরস্বতী-প্রিয়াত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবতাভিধায়িনে।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় প্রভুপাদ প্রিয়াত্মনে।
শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি ইতি নামিনে।
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমান্দমাধবম্।
দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভি সেব্যমানঃ স্মরামি॥

পরম করুণাময় পরম স্নেহময় পতিতপাবন মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদ শিরে ধারণ পূর্বক অতি নীচ ও সর্ববিষয়ে অযোগ্য এ পতিতাধম তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত

বীর্যবতী হরিবিষয়ক শিক্ষা ও উপদেশাবলী নিজ জীবনে পালনার্থে প্রবন্ধ ও কবিতা আকারে অনুকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে সকাতর নিবেদন করিতেছি।

কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণবঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্মের কথা কায়মনোবাক্য সর্বতোভাবে পালন ও প্রচারার্থে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ১৯৩৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৮ বৎসর সমগ্র বিশ্বে বিপুল আড়ম্বরের সহিত শ্রীচৈতন্যের বিমল প্রেমধর্মের কথা প্রচার করিয়া এক অভিনব চিত্তাকর্ষক আনন্দের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। তাই নিখিল বিশ্বের কোণে কোণে অনেক শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া আদর্শ ভজনময় জীবন-যাপন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ মাদৃশ পতিত অযোগ্য-ব্যক্তিকেও গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁর কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান পূর্বক হরিনাম ও চারমাস পরে নভেম্বর (১৯৩৬) মাসের শেষভাগে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দীক্ষা দান করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমি এমনই হতভাগা যে আমার দীক্ষান্তেই তিনি অসুস্থ লীলা অভিনয় করিলেন এবং আর কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষান্তে তৎকালীন গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী মহা মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ) শ্রীপাদরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও আমাকে পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পাঠাইয়া দেন। প্রভুপাদ ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৬) শেষ রাত্রে নিশান্ত-লীলায় অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী (১৯৩৭) প্রত্যুষে প্রথম যামে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই দুর্ভাগা শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সেবার বিশেষ সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। ইহাই আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। পরম করুণাময় গুরুদেব আমার ন্যায় নিরাশ্রিতগণের নিয়মনের ও পালনের জন্য তাঁহার নিজজনগণের আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন ইহাই আমার পক্ষে একটু আশার কথা ও আনন্দের কথা।

মিশনের আচার্য্য ও সভাপতি মদীয় শিক্ষাগুরু সন্ন্যাস প্রদাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ তাঁহার সুশীতল পাদপদ্মে এ পতিতাধমকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক সর্বতোভাবে পালন করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষিত হইয়া নিশ্চিন্তে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন সেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছি। বর্তমানে পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কৃপাপূর্বক হরিকথামৃত পান করাইয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্নেহময় শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিয়া আমার আধার অনুযায়ী যেটুকু সার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ কথা আমার ক্ষুদ্র লেখনীর দ্বারা প্রবন্ধ ও কবিতা আকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সব লেখনী মিশনের মুখপত্র বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" "শ্রীভক্তিপত্র" ও "শ্রীগুরুপূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি" প্রভৃতিতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সব লেখনী হইতে কতিপয় প্রবন্ধ চয়ন করিয়া কতিপয় বৈষ্ণবগণের ইচ্ছানুসারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা

করিয়াছি। এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছেন "শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত রত্নমালা" ইহাতে প্রকাশিত কবিতা প্রবন্ধগুলিতে ভক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমূহ গুম্ফিত হইয়াছে। ইহা ভক্তি সিদ্ধান্ত রূপ রত্ন দ্বারা গ্রথিত মালা বলিয়া ইহা "শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত রত্নমালা" নামে অভিহিত হইলেন।

আমার মঠবাসের প্রথম জীবনে (১৯৩৬) খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান কালে বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ (বাংলা ভাষায়) পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ ও সহকারী সম্পাদক) শ্রীপাদশুভবিলাস দাসাধিকারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজের) কৃপানির্দেশে প্রথমে পারমার্থিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের স্নেহাশীর্ব্বাদে তাঁহার আবির্ভাব তিথিতে সর্বপ্রথম শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ করার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল গুরুমহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ১৯৮০ খৃঃ ২৯ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার পঞ্চাশীতি (৮৫) তম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব তিথি পর্যন্ত প্রতিবৎসর শ্রীগুরু পূজা উপলক্ষে আমা-কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব লেখনীয় মধ্যেও কয়েকটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল।

গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া হরিকথা শ্রবণের ও সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তিনি যে সব হরিকথা বলিতেন এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ বক্তৃতা করিতেন, সেইসব

প্রচার প্রসঙ্গ দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পরম পুজ্যপাদ শ্রীলতীর্থ মহারাজ এ পতিতাধমকে কৃপা নির্দ্দেশ করায় তাঁহার প্রচার প্রসঙ্গ এবং তাঁহার কীর্তিত হরিকথা অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রিকায় পাঠাইতাম।

সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক শ্রীভক্তিপত্রের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি- স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের বিশেষ কৃপা-নির্দে'শে কখন কখন এই প্রত্রিকার প্রবন্ধ দিবার সৌভাগ্য পাইতাম। উহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিছু লেখনী এই পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কীর্ত্তিত কয়েকটি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয় গ্রাহী ভাষণের মর্ম্মও প্রবন্ধাকারে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীলভাগবত মহারাজ যখন গয়া মঠের অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ের গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকরপ্রভু তাঁহাকে উত্তর ভারতের মঠ-সমূহের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত করেছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি যখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পাটনা মঠ পরিদর্শনের জন্য শুভাগমন করেছিলেন তখন সর্বপ্রথমে আমি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি মঠবাসী ও গৃহস্থ সেবকগণকে নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে সেবকগণ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় খুব উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার স্নেহবাৎসল্যে আমার চিত্ত তখন তাহাতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে তিনি গয়া হইতে এলাহাবাদ মঠের অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হইলে আমাকেও তিনি তথাকার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সাহায্যকারী সেবক রূপে লক্ষ্নৌ হইতে আনাইয়া ছিলেন। সেই সময় তাহার সান্নিধ্যে প্রায় ৮।৯ বৎসর তথায় থাকিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য

হইয়াছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিতে-ছিলেন। তখন আমাকে কৃপা করে এলাহাবাদ হইতে তথায় আহ্বান করে নিয়েছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিগৌরব গোবিন্দ মহারাজও আমাকে কৃপাপূর্বক সঙ্গে নিয়ে তিনি চুরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপায় তখনই আমি সর্ব্বপ্রথমে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করি। তিনি মিশনের সেবাসচিব হওয়ায় পরে তাহার নির্দ্দেশে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠের, দিল্লী গৌড়ীয় মঠের ও লালা শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ কালে ঐসব স্থানে কিছু সেবায় সাহায্য করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে ১৪ ই ফেব্রুয়ারীতে তিনি আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হইতে মাদৃশ অযোগ্য সেবকাধমকেও তাঁর সচিবরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্নস্থানে ও মঠ সমূহে প্রচারকালে কৃপা করে তাঁহার সান্নিধ্যে রেখে কিঞ্চিৎ সেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষপূর্তি আবির্ভাব উৎসব পালনার্থে বিশ্ববাসী-ভক্তগণ নানাপ্রকার উপায়নে মহাপ্রভুর বহুবিধ মনোভীষ্ট সেবা করিতেছেন। আমি নিতান্ত অজ্ঞ, তাহার উপর এখন বার্দ্ধক্যবশতঃ অত্যন্ত অকর্মণ্য জড়বৎ হওয়ায় কোন সেবাই করিতে পারিতেছি না।

আপনি অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার (প্রভুর) গুণে উপজয়ে লোভ॥

এইজন্য মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ সেবায় লোভ হওয়ায় এবং কতিপয় শ্রদ্ধালু সজ্জন-গণের বিশেষ আগ্রহে আমার পূর্বপ্রকাশিত কতিপয় কবিতা ও প্রবন্ধ একত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা গ্রন্থমালাটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্পণ করিতে এ দীনাতিদীন সেবকের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তাই প্রকটাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের করকমলের মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র মালাটি মহাপ্রভুর চরণে নিবেদনার্থে অর্পণ করিলাম। নিজগুণে পতিতাধমের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিতে তাঁহার শ্রীচরণে সকাকু প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিতান্ত অযোগ্য

সেবকাধম **ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ**

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধি পত্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ-আবির্ভাব তিথি বাসরে গৌড়ীয় মিশন হইতে এই "শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" "শ্রীভক্তিপত্র" প্রভৃতি পত্রিকাতে আমার পূর্ব প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের কয়েকটী স্থানে, ছাপিতে কিছু "ছাড়" হওয়ায় উহার শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইল। সহৃদয় অদোষদরশী পাঠকগণকে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্বক শুদ্ধিপত্র মিলাইয়া এই গ্রন্থটী পাঠ করিতে কষ্ট করেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকাতে শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় মদীয় দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু-গণের বন্দনা লিপিবদ্ধ আছে। অনবধানতা বশতঃ বন্দনা ৩টী "ছাড়" পড়িয়াছে। সেইসব বন্দনাগুলি ভূমিকাতে সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় মুকুন্দপ্রিয়রূপিণে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ শ্রীতীর্থগোস্বামিনে নমঃ॥
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপিণে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদাখ্য-পুরীগোস্বামিনে নমঃ॥
নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বিজ্ঞানমূর্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

—:—

মূল গ্রন্থের ৯১পৃষ্ঠায় "নীলাচলে মহাপ্রভু" নামক প্রবন্ধটী ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুন শ্রীভক্তিপত্রের প্রথমবর্ষে ৪র্থ সংখ্যায় ৯পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

উহাতে তৎকালীন শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় যে সমস্ত আচার্য্যগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
২। „ „ শ্রীমদ্গৌরকিশোর দাসবাবাজী
(এই নামটি ছাড় পড়িয়াছিল)
৩। „ „ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
৪। „ „ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর
৫। „ „ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী ঠাকুর
৬। „ „ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ

—•—

মদীয় দীক্ষাগুরু পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে—(১৯৩৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী), পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ আমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিবিধ শিক্ষা প্রদান পূর্বক **আমার শিক্ষাগুরুরূপে** এতদিন পর্য্যন্ত লালনপালন করিতেছেন।

—•—

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত রত্নমালা গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় :—
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে শ্রীভক্তিপত্র পত্রিকায় প্রথম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় "মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর" প্রবন্ধে লিখিত ছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বিপুল ভাবে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। **তদনন্তর পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর ১০ বৎসর যাবৎ শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়াছেন।**

* * *

মূল গ্রন্থের ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠায় "শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ" প্রবন্ধে—আপনারা-সকলে শ্রীরূপরঘুনাথের কথা **"আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে** পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করিবেন।

(এইটুকু ছাড় পড়িয়াছিল)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ মিশনের গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তগণের অনেককে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে আনয়ন পূর্বক শ্রীভক্তি সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শিক্ষা প্রদান পূর্বক আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া শ্রীল আচার্যদেব মিশন হইতে ষড় গোস্বামীর গ্রন্থ সমূহ প্রকাশ পূর্বক শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং মঠবাসীর মধ্যেও অনেককে নিত্য অনুশীলনের জন্য এ সকল গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দাসানুদাসসূত্রে এই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা গ্রন্থের পাঠকগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি :—

সর্বশ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ॥

* * *

শ্রোতার পদরেণু করো মস্তক ভূষণ॥

নিবেদক

বৈষ্ণব পদরেণুপ্রার্থী

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলিকাতা—৩

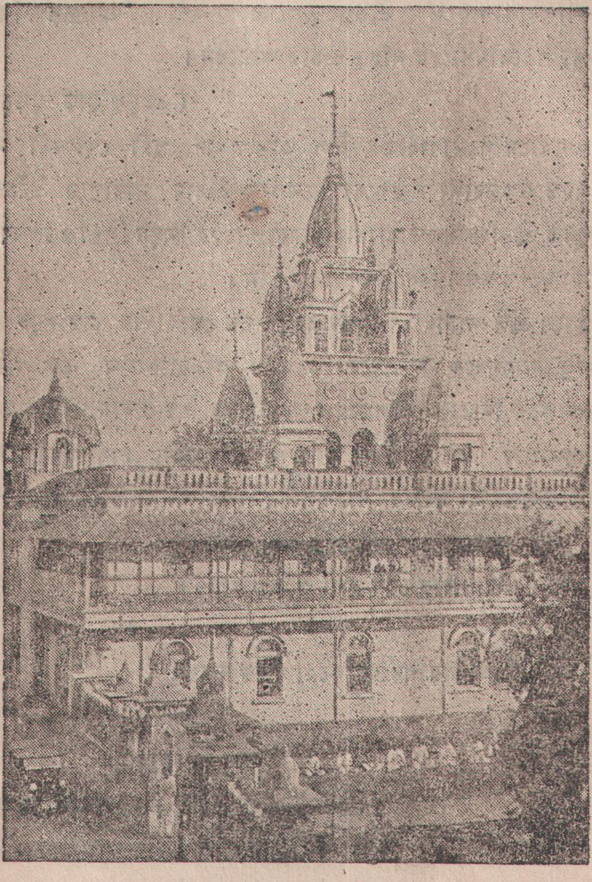

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নিবেদন

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষুদ্র সেবানুকূল্য প্রদান করিয়াছেন—তাহার দ্বারাই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। সেই সব সজ্জনদিগকে আমি আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবন্ধু ভিক্ষু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমূল্যনিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীরণজিৎ দাস বি এ প্রভৃতি অনেকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সূচীপত্র

১।	দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব,	১
২।	আমার পরিণাম নিরাশ	৪
৩।	ভগবানের সমদর্শী হইয়াও ভক্তবৎসল	৮
৪।	প্রেমিক ভক্তসঙ্গই প্রেমলাভের মূল	১২
৫।	নিজে অযোগ্য হইলেও কৃষ্ণের বাৎসল্যগুণে লোভ হয়	১৭
৬।	বৈষ্ণব-অপরাধ ও অন্যাভিলাষ ভগবদ্ ভজনের প্রধান অন্তরায়	২২
৭।	ষড়বেগজয়ী শ্রীভগবদ্ভক্তই জগদ্গুরু	২৯
৮।	দুস্তরা বিষ্ণুমায়াকে জয় করিবার উপায়	৩৪
৯।	সেবাই নিয়ম	৪০
১০।	প্রেমানন্দই শ্রেষ্ঠ আনন্দ	৪৫
১১।	শুদ্ধভক্তি	৫৩
১২।	সাধকজীবনের বিভিন্ন অবস্থা	৬১
১৩।	শ্রীকৃষ্ণ কৃপা	৬৮
১৪।	মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর	৭২
১৫।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ বিজয়	৭৭
১৬।	নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু	৮৪
১৭।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা	৯২
১৮।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্টবিজয়	১০৩
১৯।	শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্যলীলা	১১৩

২০। শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব ১২১
২১। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১২৫
২২। গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১২৮
২৩। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগ ১৩৫
২৪। শরণাগতি ১৪৭
২৫। বিমুখ জীবের মঙ্গলার্থে দশমূল শিক্ষা ১৫৭
২৬। অকিঞ্চন শরণাগত ও শুদ্ধ ভক্ত জীবন ১৬২
২৭। ভক্তি সাধকের ষড়বেগ দমনের সহজ উপায় ১৬৮
২৮। শ্রীবিগ্রহসেবা ১৭৫
২৯। শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল ১৮৩
৩০। শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে পরশান্তি লাভ ১৯০
৩১। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণবশীকরী সেবাই জীবের আনন্দ অবধি ১৯৫
৩২। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই সর্বদোষাকর কলিযুগের মহান্ গুণ ২০৬
৩৩। প্রেমভক্তির ক্রমস্তর ২১৫
৩৪। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ চিন্ময়লীলা ২১৮
৩৫। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৩২
৩৬। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ২৪২
৩৭। শ্রীগৌর আগমনী স্তুতি ২৬০
৩৮। শ্রীশচীসুত গৌরহরির বন্দনা ২৬০
৩৯। শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম ২৬১
৪০। প্রাণপ্রিয় কানাইরে ২৬৩
৪১। শ্রীজগন্নাথ চরণে কৃপা প্রার্থনা ২৬৪

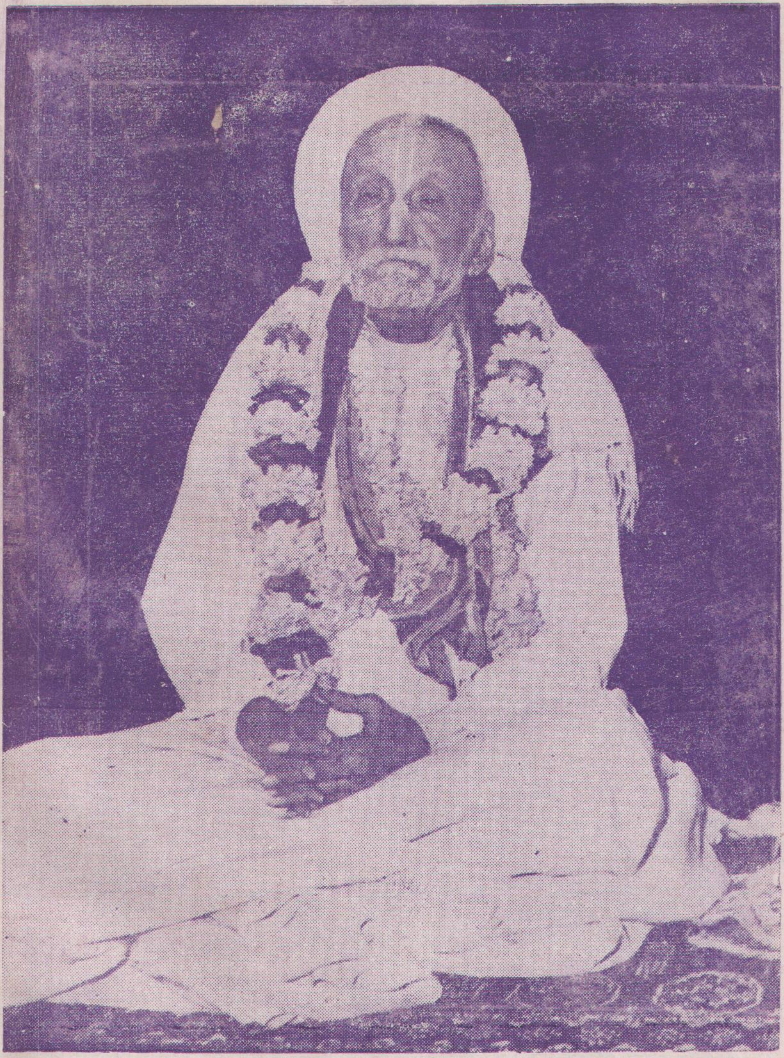

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ

শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত রত্নমালা

"দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব"

আমি গৃহ বা আত্মীয় স্বজন (?) পরিত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকৃত গৃহত্যাগীর মত সর্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কৃষ্ণভজনে ব্রতী হইতে পারি নাই। পূর্বে আমার হৃদয়ে সাধুসঙ্গলাভের স্পৃহা, মহাপ্রসাদে পূজ্যবুদ্ধি, ভগবানে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি এখন আর যেন তাহাও নাই। গুরু বৈষ্ণবের সেবার সুযোগ পাইয়াও সম্বন্ধ জানিয়া নিষ্কপটে সেবা করিতে পারিতেছি না। কারন আমি নিজেই বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি। তাই বৈষ্ণবদের চরণে আমার উচ্চ মস্তক প্রণত হইতে চায় না। চিন্ময় মহাপ্রসাদে ডাল-ভাতবুদ্ধি করিতেছি। ভগবদ্বিগ্রহকে কাঠ-পাথররূপে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। বৈষ্ণবের স্বাভাবিক লক্ষণ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আমার মনে হয়, আমার মধ্যেও এই সমস্ত গুন আছে। আমার যে দোষ আছে, তাহা নিজে দেখিতে পাই না বলেই নিজকে এরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করি। গুরুবৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আমার তত আনন্দ হয় না, যতটা আমার প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবন করিতে আনন্দ হয়। তাহার কারণ তাঁহাদের প্রতি আমার প্রীতি নাই। আমার পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে তাই পিতার যদি কোন কীর্ত্তির কথা শ্রবণ করি, তবে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমার মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ যদি আমাকে শাসন বাক্য বলেন, তবে আমারতো তাহা ভাল লাগছে না বরং তাঁহাদের বিদ্বেষ আচরণ করিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপে অপরাধের মাত্রা বেশী হইলেই ভজনরাজ্য হইতে পতন হয়।

প্রজল্প, অকার্য্য, কুকার্য্যে সমস্ত দিনরাত্রি অনায়াসে অতিবাহিত করিতে পারি, কিন্তু হরিকথা শ্রবণ করিতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। হরিকথা শ্রবণ করিতে বসিলেই নানাপ্রকার জাড্য, আলস্য, নিদ্রাদি আসিয়া শ্রবণ করিতে দেয় না। অপরাধফলে হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়াছে। তাই কৃষ্ণনামে আমার রুচি হইতেছে না।

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেন তায়।

* * *

কবে হবে বল সেদিন আমার।
অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধনামে রুচি,
(নামের) কৃপাবলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥

হরিকথা শ্রবণ করার প্রবৃত্তি না থাকিলেও কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কিন্তু কীর্ত্তন করিতে পারেন একমাত্র গুরুবৈষ্ণবগণ। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে—গুরুবৈষ্ণবকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা করিতে করিতে শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তন করা। তাই বলি দুষ্ট মন! তুমি শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে তোমার অহঙ্কার হয় কেন? গুরুসেবার জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ করিতেছি গুরুদেবেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া; তাহাতে আমার বাহাদুরী কোথায়? কিন্তু তাহাতে আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছুক হই কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি সেবার তরতম বিচার খুব করি। যিনি ঠাকুরের বাসন মার্জন করেন, তাঁহার চেয়ে যিনি ভাগবত পাঠ বা বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ এরূপ মনে করিয়া আমিও ঐ সকল সেবাকে তুচ্ছ মনে করত পাঠ, বক্তৃতাদি করিতে চাই। অন্য সেবাকাজ আমার ভাল লাগে না। প্রতিষ্ঠাশাই এ রোগের মূলবীজ। তাই আমাকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে বলিলে মনে হয়,

আমাকে উচ্চ অধিকারী জেনেই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। মায়ার কি মোহিনীশক্তি !

আমি মনে করি,—গুরু বৈষ্ণবের অতি নিকটে বাস করিলেই বুঝি আমার মঙ্গল হইবে ; আর তাঁহাদের আদেশে সেবার জন্য দূরদেশে থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গ বা মঙ্গল হইবে না। কিন্তু করুণাময় বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপাপূর্বক আমার সংশয় ভঞ্জন করিতে জানাইয়াছেন "বৈষ্ণবের নিকট আসিলেই যে তাহাদের সঙ্গ হইবে, তাহা নয়। বহু দূরে অবস্থান করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ দেখ—অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের খুব নিকটে থাকিয়াও কিরূপ বঞ্চিত হইয়া গেল, আবার যাঁহারা নিষ্কপটভাবে হরিগুরুবৈষ্ণব সেবার জন্য বহু দূরে অবস্থান করিয়াছেন তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। অতএব হরিভজনের নিষ্কপট বাসনা হৃদয়ে রাখিয়া, অর্থাৎ কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লাভের স্পৃহা হৃদয়ের সহিত অনাদর পূর্ব্বক বৈষ্ণবদের আদেশ পালনরূপ সেবা করিলেই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হয়। গুরুবৈষ্ণবগণ অন্তর্য্যামী। বিষয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্তরের সহিত তাঁহাদের কৃপাবল প্রার্থনা করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বল প্রদান করিবেন। খুব উৎসাহের সহিত সেবা করিবে। শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ছাড়া আর গতি নাই।" কিন্তু বধির আমি—অন্ধ আমি। এ সব শুনিয়াও শুনিলাম না ; দেখিয়াও দেখিলাম না। তাই আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট দৈন্যের সহিত এই প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন আমি দেহ গেহের কথা বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ক্রীতদাস সূত্রে সর্বদা তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতে পারি। শত বিপদ, শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যেন আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয় বিগ্রহের সেবা চিরদিন করিতে পারি।

আমার পরিণাম নিরাশা

সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমি সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়াছি ; শুধু তাই নয় গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবারও সুযোগ পাইয়াছি। বৈষ্ণববৃন্দ আমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তথাপি আমার কোন মঙ্গল হইতেছে না, আমি অনেকদিন মঠবাস করিলাম, বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও তাহাদের অনেক সেবা করিলাম ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনর্থ নিবৃত্তিই হইল না, হরিনামে রুচি ত দূরের কথা।

ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিতে হয় বলিয়া গুরুপাদাশ্রয় করিয়াছি। স্বজনাখ্য দস্যুগণকে ত্যাগ করিয়া তিলক মালাদি বৈষ্ণববেষ ধারণ করিয়াছি। তথাকথিত অপসম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছি।

এ জগতে বৈষ্ণব দুর্ল্লভ। জগতের অনন্ত কোটি প্রাণীসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গম আবার তিন প্রকার—স্থলচর, জলচর ও খেচর। স্থলচরের মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা খুব কম্ ; মনুষ্যের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতিকে বাদ দিলে যে সমস্ত বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি থাকে তাহাদের অনেকেই বেদ মুখে মাত্র মানে জীবনে আচরণ করে না। আর যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে অনেকে কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মী হইতে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ; কোটি জ্ঞানী হইতে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ ; কোটি মুক্তের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবের সংখ্যা খুবই কম্। আমি সেই সুদুর্ল্লভ ভক্তশ্রেষ্ঠের সেবক (?) সূত্রে আমিও নিজকে বৈষ্ণব (?) অভিমান করিতেছি।

পরমার্থ লাভের একমাত্র উপায় যে ভক্তিমার্গ, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মমার্গের দ্বারা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতি লাভ হয় ; জ্ঞানমার্গে মুক্তি পর্য্যন্ত

লাভ হয়, কিন্তু একমাত্র ভক্তি মার্গ ব্যতীত পরমশ্রেয় পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না-হইতে পারে না।

ভক্তি যোগ যাজন করিতে কোন প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় না। কেবল কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

এইরূপ সহজ উপায়ে হরিভজন একমাত্র কলিযুগ ভিন্ন অন্য কোন যুগে হয় নাই।

এই সমস্ত সহজ ভজনের কথা শুনিয়া আমি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতেছি, কিন্তু মঙ্গলের কোন লক্ষণ এ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যদি হরিকথা শ্রবণ হইত তবে শ্রবণ করিতে আরও স্পৃহা দিন দিন বৃদ্ধি হইত। শুদ্ধনাম যখন মুখে উচ্চারিত হন তখন কোটিমুখ পাইবার জন্য আকাঙ্খা হয়, শ্রীনাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করেন, তখন অনন্তকর্ণ পাইবার জন্য বাসনা হয়, শ্রীনাম যখন চিত্তপ্রাঙ্গনে উদিত হন, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করেন। সুতরাং আমার নিশ্চয় শুদ্ধনাম হইতেছে না।

সাধুসঙ্গ কি আমাদের হইতেছে? সাধুসঙ্গ এক মূহূর্ত্তের জন্যও হইলে এতদিন আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইত। সাধুর চরণে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ পূর্বক অন্যা-ভিলাষাদি পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকারে তাহার সেবা করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। আমি সাধুর পোষাক লইয়া কৃষ্ণভক্তের অভিনয় করিয়া জগতের লোকের নিকট হইতে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি। লোকে আমাকে সাধু বলিয়া যাহাতে একটু সম্মান করে, তাহার জন্য আমার যত উৎসাহ, যত উদ্যম! আমি জন-মনোরঞ্জন করিতেই পাঠ কীর্ত্তনাদি করি, গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য নহে।

মহাজন পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝিয়া "পাখীর বুলির মত" গীতি আবৃত্তি করি মাত্র। যদি একটি গীতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবিদ্যার হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই নিযুক্ত হইতে পারিতাম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির অভাব থাকা সত্ত্বেও 'আমি বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। বাহিরে অমানি মানদের ভান দেখাইলেও অন্তরে অহঙ্কারী, মান-সম্মান-প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া বসিয়াছি। পাল্যকুকুর যেরূপ সর্ব্বদা গৃহপতির দ্বারে প্রহরীর মত পাহারা দেয়, আহারাদির কোন চিন্তায় ব্যস্ত না থাকিয়া প্রভুর উচ্ছিষ্ট যাহা পায়, তাহা খাইয়াই আনন্দিত হয়; সর্ব্বক্ষণ প্রভুর গৃহে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, কোন চোর ডাকাতকে ভিতরে আসিতে দেয় না; প্রভু যখন তাহাকে স্নেহভরে ডাকেন, তখন নাচিতে নাচিতে নিকটে যায়, প্রভুকেই একমাত্র পালক রক্ষক বলিয়া জানে, সেরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইতে ত আমি পারিলাম না। কবে আমি নিষ্কপটে বলিতে পারিব,—

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

কিন্তু আমি গুরুসেবার পরিবর্ত্তে গুরুভোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। গুরুসেবা (?) কিঞ্চিৎ করিলে মনে করি, তাঁহাকে আমি কৃতার্থ করিয়া দিয়াছি। সেবার বিনিময়ে আমি নানাপ্রকার ভোগোপকরণ আদায়ের চেষ্টায় থাকি। ভজনের বদলে ভোজন বা ভোগ করিতে চাই। বঞ্চিত হইতে চাই দেখিয়া গুরু বৈষ্ণবগণ আমাকে খুব সম্মান দেন, যত্ন করেন, উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিতে দেন। কিন্তু অন্যকে খুব শ্রমসাধ্য সেবাকার্য্য দেন, শাসনাদি করেন বলিয়া আমি নিজকে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমি হরিভজনের জন্য আসিয়া আলস্যভরে নিশ্চিন্ত হয়ে দিনের পর দিন দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করিতেছি। গুরু সেবায় উৎসাহ হইতেছে না ; বরং গুরুসেবার উপকরণ সমূহে গুরুবুদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে কখনও ভোগবুদ্ধি আবার কখনও ত্যাগবুদ্ধি অনাদর, অযত্ন করিতেছি। কিন্তু আমার শরীর আমার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে মমত্ববুদ্ধি থাকায় যত্নের কোন অভাব হইতেছে না। হায়! কবে আমি গুরুসেবায় সর্বপ্রকার নিযুক্ত হইয়া অনিত্য দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা করিতে পারিব। আয়ুঃ-সূর্য্য দিন দিন অস্তমিত হইতে চলিতেছে। হরিভজনে বাধা দিবার জন্য শত শত বিপদ আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

প্রতিদিন বহু প্রাণীকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে দেখিতেছি, তথাপি আমার মৃত্যু হইবে, এরূপ চিন্তা কখনও আমার হয় না। "মরিতে হইবে" এরূপ চিন্তা থাকিলে এক মুহূর্ত সময়ও গুরুসেবা ব্যতীত বাজে কাজে ব্যয় করিতাম না। অপরাধী ফাঁসীর আদেশ পাইয়া কি আর বিষয়ভোগাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে? মঠে আসিবার পূর্ব্বে যখন হরিভজনের কথা মনে হইত, তখন যে কত উৎসাহ কত আশা ভরসা হইত, তাহা এখন একবারও চিন্তা করি না। মাতাপিতাদি আত্মীয়স্বজনগণকে নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া হরিভজনের জন্য এখানে আসিয়া কিরূপ ভজনের অভিনয় করিতেছি, তাহা একবার চিন্তা করিয়াও দেখি না।

জীবনের অধিকাংশ সময় নিদ্রাতে আর কতকদিন রোগশোকে কাটিয়া গেল। শৈশবকাল আত্মীয়স্বজনের স্নেহেতে ও অজ্ঞানতায়, কিশোরকাল জড়বিদ্যা শিক্ষাতে অতিবাহিত হইল, এখন মঠে আসিয়া হরিভজনের অভিনয় করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চোখে ধূলি দিয়া সেবার নামে ভোগ করিতেছি। যাহাতে তাঁহাদের প্রীতি হয়, তাহা না করিয়া আমার খামখেয়ালী কার্য্যে ব্যস্ত আছি। এইরূপে গুরুবৈষ্ণবকে উপেক্ষা বা তচ্চরণে মর্ত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিয়া চির-দিনের জন্য কুম্ভীপাক নরকভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। গুরুবৈষ্ণবাপরাধী

সাধুবেষধারী আমা অপেক্ষা পাপপরায়ণ বিষয়ী অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহাদের একদিন না একদিন মঙ্গল হইতে পারে; কিন্তু আমার আর মঙ্গলের কোন আশা নাই।

তাই বলি, হে পতিতপাবন অদোষদর্শী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব! আমি নিতান্ত অজ্ঞ; আমার কিসে ভাল হয় জানি না, আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া এ পতিতাধম, বিমুখ জনকে আপনার নিত্য মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রদান করুন-নতুবা আমার পরিণাম নিরাশা।

শ্রীভগবান সমদর্শী হইয়াও ভক্তবৎসল

মনুষ্য মাত্রই মাতাপিতা, ঋষি, দেবতা, ভূত ও আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট ঋণগ্রস্থ হইতে বাধ্য হয়। এই পঞ্চঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা প্রত্যেক মনুষ্যের নিতান্ত কর্তব্য। (১) মাতাপিতা সন্তানকে শৈশবকাল হইতে কত কষ্ট স্বীকার করিয়া লালন পালন করেন। সন্তানের সুখের জন্য তাহারা নিজেদের আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তাই সন্তানগণ মাতাপিতার নিকট অত্যন্ত ঋণী। (২) ঋষিগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া হিতাহিত অনভিজ্ঞ মনুষ্য সমাজের মঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন। তাই মনুষ্যগণ ঋষিদের কাছে ঋণী। (৩) চন্দ্রদেবতা স্নিগ্ধ জোৎস্না দানে, দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষাদানে এবং অন্যান্য দেবগণ মনুষ্যগণকে নানা প্রকার ভোগোপকরণ প্রদান করেন। তাই মনুষ্যগণ দেবতাগণের নিকট ঋণী। (৪) বন্ধু বান্ধবাদি আপ্তগণ মনুষ্যগণের জীবিকা নির্বাহে নানা প্রকার সহানুভূতি করেন। তাই উহাদের নিকট মনুষ্যগণ

ঋণী। (৫) গরু-মহিষ, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীগণ মনুষ্যগণের জীবণ ধারণে বিভিন্ন প্রকারে আনুকূল্য বিধান করে। তাই মনুষ্যগণ উহাদিগের নিকটেও ঋণী হইয়া থাকে। এই পঞ্চঋণ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রত্যেক মনুষ্যকেই বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন। এইসব ঋণ হইতে মুক্তি হইতে না পারিলে উহাদিগকে অবশ্য নরক গমন করিতে হয়। এই ঋণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য শাস্ত্র পঞ্চ যজ্ঞের বিধান দিয়াছেন :—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।
(মনুসংহিতা)

(১) ঋষিগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে অধ্যাপনারূপ যজ্ঞযাজন দ্বারা ‘ঋষিঋণ’ শোধ হয়। (২) বিবাহ দ্বারা পুত্র উৎপাদন পূর্বক পিতৃ তর্পণ যজ্ঞ করাইতে পারিলে “পিতৃঋণ” শোধ হয়। (৩) দেবতাগণের যাজন করিলে ‘দেবঋণ’ শোধ হয়। (৪) প্রাণীগণকে খাদ্যাদি অর্পণ পূর্বক প্রীতির ব্যবহার করিলে ‘ভূতঋণ’ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (৫) অতিথিদিগকে অন্নদানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিলে ‘নৃ ঋণ’ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

এবংবিধ পঞ্চযজ্ঞ যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিলে ও ঐ পঞ্চঋণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ঐ যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করিতে কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। তাই যজ্ঞসম্পাদনের সুফল লাভ করা যায় না। এইজন্য সুবুদ্ধিমান জনগণ পার্থিব কর্ত্তব্য ও কামনা বাসনাদি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক পরম আশ্রয়নীয়, পরম আরাধনীয়, সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শরণাগত হইয়া ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার ভজন করেন। একমাত্র তাঁহাকে ভজন করিলেই সমস্ত ঋণ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়। ঐ পঞ্চঋণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিংকরো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥
(শ্রী ভাঃ ১১।৫।৪১)

ঐকান্তিক ভক্তগণ একমাত্র শরণীয় পরম মুক্তি প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সর্বতোভাবে সেবা করেন। পৃথক ভাবে অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করেন না বা পার্থিব ভোগের কর্তব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন না। কেননা,—

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।

*   *   *

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখা পল্লবের বল।"

সর্বমূলাধার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনন্যভাবে সেবা করিলে সুদুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয় এবং আনুসঙ্গিকক্রমে বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য পালনের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় বাসনার বীজও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।

প্রাক্তন কর্ম বশতঃ বা কোন প্রকার অনবধানতা দরুন যদি অনন্য ভক্ত কর্তৃক বিশেষ পাপ বা মহাপাপও কৃত হইয়া পড়ে। তবে ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তদীয় প্রিয় ভক্তের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত থাকেন। তখন হইতে ঐ ভক্তের হৃদয়ে আর কোন প্রকার পাপ বাসনাও উদয় হইতে পারে না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(শ্রী ভাঃ ১১।৫।৪২)

শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তথাকথিত বর্ণাশ্রমের পূণ্যকর্ম সমূহের অনুষ্ঠান ত করেন না উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। পূণ্যকর্ম করেন না বলিয়া কি নীতিধর্ম্মাবিরুদ্ধ নিষিদ্ধ পাপ কর্ম্মে আসক্ত হন? তাহাও নহে, তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক কোনপাপ বা পূণ্য কর্ম্মে আসক্ত হন না। কারণ পরমানন্দ-কন্দ শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দে বিভোর থাকায় পার্থিব বা স্বর্গীয় জড়ানন্দে তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিতে পারেন না। ভগবৎ সেবায় এত দিব্য আনন্দ বর্তমান আছে যে, পার্থিব জড়ানন্দ এমনকি মোক্ষানন্দ ও ঐ আনন্দের নিকট তুচ্ছ। ভক্তগণের

মন যখন স্বর্গ সুখ প্রাপ্তি মূলক পূণ্যকর্ম প্রতি ধাবিত হয় না। তখন নিষিদ্ধ পাপকর্ম প্রতি কি প্রকারে ধাবিত হইবে? অর্থাৎ তাঁহারা কখনও পাপ কর্মে লিপ্ত হইতে পারে না।

ভগবান সমদর্শী হইয়াও ভক্তবৎসল। ভক্তের প্রতি তাঁহার 'পক্ষপাত' দোষ আছে। ইহাই ভগবানের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বীয় অনন্য ভক্তের কোন দোষ দর্শন করেন না। যাহাকে ভালবাসা যায় তাঁহার দোষ চোখে পড়ে না। ভক্ত দোষ করিলেও তিনি নিজেই তাঁহার দোষ সংশোধন করিয়া আত্মসাৎ পূর্বক তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ গতি প্রদান করেন। অন্যান্য পাপীর ন্যায় শাস্তি ভোগের জন্য তাহাকে যমপুরে যাইতে হয় না। এমন-করুণাময় প্রভুকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভজন করেন না। অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তবৎসল ভগবানের ভজন করা নিতান্ত কর্তব্য।

"ভক্ত বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেনকৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।"

শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের সমস্ত কামনা সম্যগরূপে পূর্ণ করেন। এমনকি নিজেকে পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। অথচ, তাঁহার কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ভগবান সমদর্শী হইয়াও যে সকল ভক্তগণের প্রতি এত পক্ষপাতিত্ব করেন সেইসব ভক্তগণ জগতে অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও এখনও জগতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের বর্তমানতার জন্যই এই বিবদমান কলিকালেও 'মহানন্দের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতেছে'। ভাগ্যবান জনগণই ঐ প্রকার মহাভাগবত-গণের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন। উহাদের প্রেমময় সেবায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমিক ভক্তের হৃদয় হইতে কখনও অন্তর্হিত হইতে পারে না। অধিকন্তু তিনি উহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া চির অধীনতা স্বীকার করেন।

প্রেমিক ভক্তসঙ্গই প্রেম লাভের মূল

৮৪ লক্ষ যোনী প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র মহাজনগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই হিংস্র পশুর ন্যায় আহার শৃঙ্গারাদিতে প্রমত্ত হইয়া জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ইন্দ্রিয়দ্বারা উহারা কেবল রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় ভোগ করিতে চেষ্টা করে। বাক্, পাণী, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা বিবিধ পাপকর্মে আসক্ত হইয়া পড়ে। নিরীহ প্রাণীগণকে হনন করিয়া উহাদের মাংসে জিহ্বেন্দ্রিয়ের তোষণ করে; স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য দুর্নৈতিক পাপকর্ম করিতে ও দ্বিধা বোধ করে না; চুরি, ডাকাতি, হিংসা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্ম করিতে উহারা বিন্দুমাত্র ও সংকোচ করে না। সর্বদ্রষ্টা পরমপিতা 'ভগবান্' বলিয়া একজন কেহ আছেন; ইহা তাহারা কখন চিন্তাও করে না। বিজ্ঞগণ এই শ্রেনীর মনুষ্যকে 'নাস্তিক, ও 'দুর্নৈতিক 'নরপশু বলিয়া থাকেন।

ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত বিচার ধারার আর এক শ্রেণীর মনুষ্য আছে। পূর্বোল্লিখিত দুর্নৈতিক নাস্তিকগণের ন্যায় আত্মসুখ বাঞ্ছা ইহাদের থাকিলেও ইহারা সুখময় জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য শারিরীক ও সামাজিক কতগুলি নীতি বা বিধি, স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ঐ নৈতিকতার মধ্যে ভগবৎ বিশ্বাস বা আস্তিক্য ভাব রাখিতে চায় না। কারণ 'ভগবান' বলিয়া একজন 'সর্বনিয়ন্তা' আছেন ইহা বিশ্বাস করিলে স্বসুখকর কার্য্য করিতে হৃদয়ে সর্বদা একটা 'ভয়, বর্ত্তমান থাকিবে। এইরূপ ভিতচিত্তে আত্মসুখকর কার্য্য করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া এই জগৎ পিতা জগদীশ্বরের প্রতি তখন একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যকতা হইবে। তাই উহারা নীতি পরায়ণ হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। অথচ

উঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য অনেক সময় নীতিকে ও লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। দুর্নৈতিকগণ অপেক্ষা নীতিবাদি মনুষ্যগণ কিছু উন্নত শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ মনুষ্য ও পশুর মধ্যে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন বৃত্তি থকিলেও মনুষ্যের মধ্যে 'ধর্মজ্ঞান' বা 'সৎ অসৎ' বিচার বোধের উদয় হইতে পারে, কিন্তু পশুর মধ্যে এই ধর্মজ্ঞানের উদয় হয় না।

নৈতিক জীবনের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস উদিত হইলে পারমার্থিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এখান হইতেই দর্ণাশ্রম ধর্ম আরম্ভ হয়। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম-যাজীগণ ধর্ম অর্থ কামাদি লাভ করিরা এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই গতাগতি করে। কিন্তু যাহারা ভগবানকে বাদদিয়া শুধু বর্ণাশ্রমের কর্তব্য করিতে ব্রতী হয় তাহাদের অধোগতি লাভ হয়।

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

অধিকার অনুসারে বর্ণাশ্রমের নীতি সমূহ পালন করিলে ক্রমোন্নতি হয়। ব্রহ্মচারীগণ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে গুরুসেবার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধর্ম সমূহ পালন করেন। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যকর কোনো ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের যাইতে নাই। এই প্রকার নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরু পাদপদ্মের নিয়ামকত্বে ভগবৎ সেবা করিতে করিতে জড়ীয় বিষয়ভোগ সুখের অসারতা অনুভূত হইলে উন্নত সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকার লাভ হয়। কিন্তু যাহারা বিষয়ভোগ বাঞ্ছাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে পারে না, অধিকন্তু তাহাদের মন সর্বদা পাপাসক্ত হইতে চায়। তাহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আজ্ঞা লইয়া শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে কর্মপন্থায় মঙ্গল লাভের জন্য গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করে।

শাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমকে একটা শিক্ষানিকেতন বলিয়াছেন। গৃহস্থগণ গর্হণ মুখে বিষয় ভোগ করিতে করিতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিয়মাকত্বে ভগবৎ সেবা করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিষয় সুখের অসারতা অনুভব করিতে পারে।

"বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভব বন্ধ॥"

এই অনুভূতির ফলে উহারা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম বা পরে সন্ন্যাস আশ্রমে উন্নত হয়।

বিষয় বৈরাগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয় এবং তিনি যদি অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সুখকর সেবায় নিযুক্ত করেন। তবে ঐ বিষয় মুক্ত পুরুষ অতি শীঘ্রই কৃষ্ণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে বিশেষ বড় কথা বলিয়া আমলদেন নাই। তবে বর্ণাশ্রম ধর্মে বিষ্ণুর সহিত একটু সম্বন্ধ থাকে বলিয়া ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ আদর করিয়াছেন মাত্র।

"এতসব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈক শরণ।"

গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বশেষ শিক্ষায় জানাইয়াছেন,—

বর্ণাশ্রমাদি সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমার শরণ গ্রহণ কর।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

কৃষ্ণ পাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে, তদীয় অন্তরঙ্গ কোন বিশুদ্ধ ভক্তের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রতী হওয়া।

যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎ নিজজন কোন বিশুদ্ধ ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ করিয়া হরিকথামৃত পান করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় তন্ময়তা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

সাধুসঙ্গে 'আসক্তি' ও 'কৃষ্ণকথায় রুচি' মহাপ্রভু এই দুই তত্ত্বকে কৃষ্ণ প্রেমলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ নিজজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ও ঐ পন্থাকেই আশ্রয় করিয়াছেন।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি—
যে প্রায়শোঽজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

কৃষ্ণ কথায় রুচি লাভের দুইটি উপায় আছে—(১) প্রাক্তন সুকৃতিফলে কৃষ্ণকথায় রুচি হয়। ইহালাভ করিতে জন্মজন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। (২) সাধুর অহৈতুকী কৃপায় অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কৃষ্ণ কথায় রুচি হইতে পারে এইজন্য বলিতেছেন :—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥"

সাধুসঙ্গ বলিতে ভক্তসঙ্গকেই বুঝায় ভক্তসঙ্গ দুই প্রকার 'প্রসঙ্গ রূপাসঙ্গ' ও 'পরিচর্য্যারূপাসঙ্গ' কৃষ্ণভক্তের নিকট ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে অভ্যাস করিতে হয়। ইহাকেই 'প্রসঙ্গরূপা' সঙ্গ বলে ভক্তের ব্যক্তিগত সেবাকেই 'পরিচর্যারূপ' সঙ্গ বলে।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে বদ্ধজীবের জন্মজন্মান্তরের দুর্দমনীয় 'বিষয়ভোগ বাসনা' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দমিত হয়। অনেকে মনে করে ক্রমপন্থায় বিষয়ভোগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইবে নতুবা পতনের আশঙ্কা থাকিবে। কিন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদযদ্ভব্যং ভবতু ভগবান্ পূর্বকর্মানুরূপম্।

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

ভোগের দ্বারা ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। বরং আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধুসঙ্গের ফলেই প্রকৃত পক্ষে বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিষয় ভোগান্তে বৈরাগ্য লাভের যে চেষ্টা উহাতে 'প্রকৃত বৈরাগ্য' লাভ হইতে পারে না। বিষয়ভোগের যে সমস্ত চিত্র নিজ হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়, তাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই মিটাইতে পারে না। উহা পাষাণের রেখার ন্যায় হৃদয়ে একটা কঠিন দাগ বসিয়া যায়। ভোগাভাবে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের উদয় হইলেও ব্যতিরেকভাবে বিষয় চিন্তা হৃদয়ে জাগরিতই থাকে। কেহ কেহ মনে করে, "যারা বিষয়ভোগ করে নাই তারা কি করিয়া বিষয়ত্যাগ করিবে? 'ভোগ' করিলে 'ত্যাগ' করা যায়। বিষয়ের মধ্যে কি 'গলদ' আছে জানিতে পারিলে উহাত্যাগ করা যায়। নতুবা ত্যাগ হয় না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথার কোনো মূল্য নাই। কারণ বৃহৎব্রতী ভক্তি সাধকগণ বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়াও শ্রীগুরু পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ও শিক্ষার প্রভাবে বিষয়িগণের দুর্ভোগ ও ভীষণ দুরবস্থা দূর হইতে দর্শন করিয়াই বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে বৈরাগ্য অনুভব করিয়া থাকেন। পৃথকভাবে বিষয়ভোগ করিয়া উহার অসারতা বোধ করিবার প্রয়োজন হয় না।

শুদ্ধভক্তিতে 'ভোগ' 'ত্যাগ' বলিয়া কোনো কথা নাই। শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-সেবকগণ ভোগও করেন না ত্যাগ ও করেন না। তাঁহারা যে কোনো বর্ণ বা আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করেন ও কায়মনবাক্যে নিরন্তর প্রেমিক ভক্ত সঙ্গে অনুকূল কৃষ্ণ সেবায় নিরত হইয়া প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। ইহাছাড়া আর কিছু জানেন না।

নিজে অযোগ্য হলেও কৃষ্ণের বাৎসল্য গুণে লোভ হয়

ভগবৎ বিমুখ মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত দোষে দোষী হয়েও নিজের দোষ অনুভব করিতে পারে না। ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অত্যন্ত অযোগ্য হলেও যে নিজেকে মনে করে "আমি বুদ্ধিমান" "আমি গুণবান" "আমি ন্যায় পরায়ণ" আমি চতুর, "আমি সুসভ্য" আমি সত্যবাদী, আমি উচিৎবাদী "আমি পরোপকারী" "আমি নির্ভীক" আমি নির্দোষী, আমি সব বুঝি। প্রতিদিন প্রতি পদে পদে তাঁর অযোগ্যতা মুর্খতা, দুর্বুদ্ধিতা, অসমর্থতা অসর্বজ্ঞতা প্রমাণিত হলেও সে অতি শীঘ্রই উহা ভুলিয়া যায়। সে অন্যকেই দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু সে নিজের কোনদোষ বুঝিতেই পারে না। এমনকি ভক্তি মার্গের সাধকগণের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ নিজের দোষ ত্রুটী দেখিতে পায় না। অধিকন্তু অপরকেই দোষী নির্ণয় করিয়া থাকে। সে মনে করে অন্যের দুর্ব্যবহারে বা অন্যায় আচরণের জন্য সে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করতে পারছে না। অন্যের জন্যই সে ভজনে উন্নতি করতে পারছেনা। কিন্তু সে নিজের কোন প্রকার অযোগ্যতা বুঝিতে পারে না। ইহাই তার মন্দ ভাগ্যের পরিচয়।

শরণাগত ভক্তের চরিত্রে "দৈন্য" একটা অসাধারণ গুণ। তিনি সর্বগুণে গুণী হইয়াও নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন অনুভব করেন। ইহা তার কপটতা নয়। ইহা তাহার স্বাভাবিক সরল বৃত্তি। দীনাভিমানীর প্রতি ভগবানের দয়া অধিক।

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান্॥

দীন অভিমানী বৈষ্ণবের সহজেই সকল সহনে সহিষ্ণুতা গুণের উদয় হয়। নিজের অমানীতা বোধ হইলে অন্যকে সম্মান দিবার বৃত্তি উদয় হয়। যাহার

মধ্যে দৈন্য, সহিষ্ণুতা, অমানী ও মানদ এই চারটি গুণ দৃষ্ট হয়। তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব এবং তিনিই হরি কীর্ত্তনের অধিকারী। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
দৈন্য, দয়া অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জন।
চারি গুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন :—

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

ভক্তি যাজী সাধুগণ শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের অনুশাসনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াই নিজ অযোগ্যতা বোধে দীনতার সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অকপটে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে নিবেদন করেন :—

আমি অপরাধীজন সদা দণ্ড্য দুর্ল্লক্ষণ
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে পতিত বিষম ঘোরে
গতিহীন গতি অভিলাষী॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল
অহৈতুকী কৃপাচাই॥

হে প্রভু! আমি মহাপাপী। মহাপরাধী। হেন দুষ্টকার্য্য নাই যাহা

আমি সহস্র সহস্রবার করি নাই। সেইসব পাপের ফলই এখন আমাকে মহাদুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে রেখেছে। উহা হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় এখন দেখিতেছি না। আমি পশুর ন্যায় আচার বিচার বিহীন। অনাচার দুরাচারে এমন আসক্ত হয়ে পড়েছি যে, উহা কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারছি না। আমার কোন প্রকার ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি নিষ্ঠা নাই। আমি অতিশয় চঞ্চলমতি, কামক্রোধাদিতে আসক্তি, হিংসাদ্বেষ পরায়ণ, পরবঞ্চনে দক্ষ, বিষয়ী, ভোগী, সর্বদোষাকর এবং সত্যসত্য আমার কোন প্রকারই সদ্গুণ নাই। হে প্রভো! আমার ন্যায় পতিতাধম দুরাচার এজগতে আর কেহ নাই। আমি এমনই নির্ঘৃণ্য অযোগ্য যে, আমি নিজেই নিজের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। এমতাবস্থায় আমি নিরুপায় হয়ে অগতির গতি আপনার শ্রীচরণে শরণ লইলাম।

হরি হে!

আমিত পতিত পতিত পাবন
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি তোমার চরণে
শরণ লইনু হাম।
অতি অপকৃষ্ট আমি পরম দয়ালু তুমি
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয় তব দয়া তত তায়
তাতে আমি সুপাত্র দয়ার॥

শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিরূপে কলিযুগে প্রকটিত। সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তদীয় প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুদেবকে নিত্যকাল জগতে প্রকটিত রেখে মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ যাকে কৃপা করতে ইচ্ছা করেন; তদীয় নিজজন শ্রীগুরুদেবের দ্বারাই তার প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখান আপনে ॥

ইহাই বদ্ধজীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার পরিচয়। তিনি যদি জীব বান্ধব শ্রীগুরুদেবকে জগতে প্রকটিত না রাখতেন, তবে বিমুখজীব কখনই নিজের চেষ্টায় ভগবদুন্মুখী হতে পারতো না। শৃঙ্খল দ্বারা হস্তপদ বদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ নিজের চেষ্টায় বন্ধন মুক্ত হতে পারে না, সেইরূপ মায়াবদ্ধজীব স্বচেষ্টায় মায়া মুক্ত হতে পারে না। এইজন্য মায়ামুক্ত শ্রীগুরুদেবই বদ্ধ জীবের মায়া বন্ধন ছেদন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি আর একটি মহতী কৃপা প্রকাশ করেছেন—বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করে। ইহা দ্বারা জীব কৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং কৃষ্ণই পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীব হৃদয়ে প্রকটিত হয়ে তিনি যে একমাত্র প্রভু ও ত্রাতা ইহাও অনুভব করান।

কর্ম্মবদ্ধ জ্ঞানবদ্ধ আবেশে মানব অন্ধ
তারে কৃষ্ণ করুণা সাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর ॥
বিধি মার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ বশবর্ত্তী হয়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জীবের অকৃত্রিম বান্ধব শ্রীগুরুদেবকে এজগতে নিত্যকালই প্রকট রেখেছেন। আবার সেই শ্রীগুরুদেবও কৃপা করে মঙ্গল প্রার্থী জীবগণকে, প্রথমে কলিমলহারী শ্রীহরিনাম ও দীক্ষামন্ত্র প্রদান করছেন। তারপর শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি সহ শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী

আদি পার্ষদগণের দিব্য সঙ্গলাভের শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভূমি গোষ্ঠবাটী শ্রীরাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন শৈলাদি দর্শনের সুযোগ প্রদানও করছেন এবং পরিশেষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা প্রাপ্তির আশাও জানাইতেছেন। এইজন্য কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ লাভই শ্রীকৃষ্ণের অসীম করুণার প্রকাশ বলিয়া জানা যায়।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা মাধবাশাং
প্রাপ্ত যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

জীব নিজের অসংখ্য অযোগ্যতা বা অবগুণের দিকে দৃষ্টি করে নিজেকে কৃষ্ণ কৃপা লাভে সম্পূর্ণ অনধিকারী বোধে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু সে যখন শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার অহৈতুকী কৃপার দিকে দৃষ্টি করে তখন তাঁর হৃদয়ে অসীম আনন্দ প্রেমানন্দ প্রাপ্তির লোভ সঞ্চার হয়।

আপনি অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥

ঐ লোভের বশবর্ত্তী হয়ে সে তখন শ্রীগুরু কৃপাবলে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা লাভ পূর্ব্বক প্রেমানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

‘বৈষ্ণবাপরাধ’ ও ‘অন্যাভিলাষ’ ভগবদ্ ভজনের প্রধান অন্তরায়

ভগবদ্ বিস্মৃত অনন্ত জীবনিচয় নিজ নিজ কর্মানুসারে উচ্চাবচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইতেছে। অনন্ত জীবসমূহের মধ্যে মনুষ্যজাতির সংখ্যা অতি অল্পতর, মনুষ্যের মধ্যে নাস্তিক্য ভাবাপন্ন ও পশু প্রকৃতির লোক সংখ্যা অধিক। বৈদিক ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কম্, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি মুখে মাত্র বেদ স্বীকার করে; বৈদিক বিধানানুসারে চলে না। অধিকন্তু বেদ নিষিদ্ধ কুকর্মে রত থাকে, ধার্মিক জীবন যাপন করিতেও চাহে না অথচ নিজদিগকে বেদানুগ বলিয়াই পরিচয় দেয়। বেদনিষ্ঠজনের মধ্যে প্রাকৃত ধার্মিক লোকের সংখ্যা খুব কম, বেদবিহিত কর্মপরায়ণ ধার্মিকগণ অনিত্য ভোগকামনার জন্য ‘দান’ ‘পুণ্য’ ‘ব্রত’ যজ্ঞাদি’ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে। কোটি কোটি কর্মীর মধ্যে একজন হয়তো কর্মফলের অনিত্যতা অনুভব করিয়া কর্ম হইতে বিরত হয় এবং জ্ঞানাবলম্বে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হয়। এবংবিধ কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে হয়ত একজন ‘মুক্ত’ হইতে পারে। আবার ঐ প্রকার কোটি কোটি মুক্তের মধ্যেও একজন শুদ্ধ ভক্ত পাওয়া দুর্লভ। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ঐ প্রকার একজন ভক্ত এক একটি ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে (চতুর্দশ ভূবনবাসীকে) উদ্ধার করিতে পারেন।

“ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।”

এই সমস্ত কৃষ্ণভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে রত থাকেন, নিজ সুখের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন না। এইজন্য তাহাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকে। কিন্তু ‘ভুক্তিকামী, ‘মুক্তিকামী’ ‘সিদ্ধিকামীগণ’ নিজ নিজ

সুখ কামনায় সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তাহাদের চিত্ত কখনও স্থির হইতে পারে না। তাই বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা অতি দুর্লভ।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥"

(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৪)

নিজের চেষ্টায় কেহই ঐ প্রকার শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারে না। ভগবদ্ ভক্তের অহৈতুকী কৃপা ও সাধকের ঐকান্তিক সাধনচেষ্টা হইলে ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ করিতে পারে।

কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি উত্তম বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করিলে বৈদ্য তাহার দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় করিবার জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রদান পূর্বক নিয়মিত রূপে সেবন করিতে বলেন এবং কুপথ্য বর্জ্জন করিতেও নির্দ্দেশ করেন। রোগী যদি "ঔষধ সেবন" ও "কুপথ্য গ্রহণ" দুইটি একসঙ্গেই করিতে থাকে, তবে রোগ নিরাময় হইতে পারে না; বরং রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্য রোগী যদি যত্ন-পূর্বক কুপথ্য বর্জন করিয়া ঔষধ নিয়মিত সেবন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর সুপথ্য গ্রহণ করেন তবে অনতিকাল মধ্যে রোগ মুক্ত হইয়া সুস্থ সবল শরীর লাভ পূর্বক স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ যদি ভবরোগগ্রস্ত, ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিও ভবরোগ নিরাময়ের জন্য ভগবানের নিজজন সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিয়া দৈন্য আর্তিহৃদয়ে তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে শ্রীগুরুদেব তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া হরিকথা মহৌষধি পান করান, তখন ঐ গুরুপদাশ্রয়ী ভক্তিসাধক গুরুপাদ পদ্মের নির্দ্দেশানুসারে ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে করিতে অপরের নিকটও শ্রৌতবাণী কীর্তন করিতে থাকে, শ্রবণ কীর্তন প্রভাবে ক্রমে ক্রমে উহার জন্মজন্মান্তরের পাপ, অপরাধ, অনর্থাদি ভক্তি প্রতিকূল বৃত্তিসমূহ দূরীভূত

হইতে থাকে এবং ভক্ত-ভক্তি ভগবানে 'নিষ্ঠার' উদয় হইয়া ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে শ্রবনে বিশেষ রুচি হইতে থাকে। ঐ সময়ে তাকে শাসন করিয়া ভয় দেখাইয়া সেবা করাইতে হয় না; আপনা হইতেই প্রীতিযুক্ত হইয়া সেবা করিতে থাকে এক মুহূর্ত্ত ও বৃথা কার্য্যে সময় নষ্টকরিতে পারে না। দৈবাৎ ভক্তি যাজনে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইলে উহাতে তার অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হইতে থাকে। এই প্রকার 'আসক্তি' নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর 'ভাবের' উদয় হয়। উহার গাঢ়তা হইলেই ভক্তিসাধকের বিশুদ্ধ 'প্রেমের' অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তখন তাহার স্নিগ্ধ অন্তঃকরণে কৃষ্ণ প্রিয়তা গাঢ় হইয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

প্রেমভক্তি লাভের ক্রমপন্থা বিষয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকনাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।"

"বৈষ্ণবাপরাধ" ও "অন্যাভিলাষ" এই দুইটি ভজনের প্রধান অন্তরায়— ভক্তিসাধককে সাধনোন্নতিতে বিশেষ বাধা প্রদান করে, পরমবান্ধব শ্রী-শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবেই সাধকগণ ভক্তির ক্রমোন্নতিরস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দুর্দৈব বশতঃ যদি উহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণকে প্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞানে অসম্মান, অমর্য্যাদা বা নিন্দা করে এবং উহাদিগকে, সমকক্ষ মনে করিয়া উহাদের সহিত পাল্লা দিতে যায়, তবেই বৈষ্ণবাপরাধের সৃষ্টি হয়, কামলারোগী যেরূপ সকলকে পীতবর্ণ দর্শন করে। সেইরূপ পাপমলিনচিত্ত ব্যক্তিগণ অকলঙ্ক চরিত্র সাধুদিগের চরিত্রেও দোষদর্শন করিয়া নিন্দা করে; ফলে উহাদের চিত্ত পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া ভক্তি হইতে চ্যুত হয়। "যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাথা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে,

তার 'শুখি' যায় পাতা"। নিজদিগকে 'বৈষ্ণব' অভিমান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেই উহাদের চরণে অপরাধ হইয়া থাকে এবং উহার ফলে অধোগতি হয়।

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে,
অমানি না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দুষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

কাম ক্রোধাদির দাস হইয়া ভগবৎ নিজজন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে নিজেদের সমকক্ষ বা নিকৃষ্ট মনে করিলে মহাপরাধ হয়। শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবকে পূজ্য বুদ্ধিতে সর্বদা সম্মান করা উচিত "শ্রীহরিদেব" শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের আসন তিনটি সর্বদা রক্ষিত (Reserve) রাখা উচিত, এ আসনে বসিবার স্পৃহা কখনও করিতে নাই। নিজে কখনও 'সোঽহং' বুদ্ধিতে ক্ষুদে ভগবান সাজিয়া ভোক্তার অভিমান করিতে নাই। অপরের উপদেষ্টা বা নিয়ামক হইবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া 'গুরুগিরি' করিবার দুর্বাসনা চিত্তে স্থান দিতে নাই। কৃত্রিম উপায়ে 'বৈষ্ণবী মর্য্যাদা' লাভের জন্য কখনও লালায়িত হইতে নাই। এসব বিষয়ে সাধকগণ সতর্ক না হইলে অপরাধবশতঃ ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুত হইতে হয়। "তাতে মালী, যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম"। অপরাধী জনের শ্রবণ কীর্তনাদি করিতে আর রুচি থাকে না। পক্ষান্তরে অভক্তিপর কর্ম করিতে খুব উৎসাহ দেখা যায়।

"অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।"
"কৃষ্ণনাম সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয় সুখেতে ভোর॥"

বৈষ্ণবাপরাধ ফলে ভক্তির প্রগতি স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। এমন কি ভক্তি

হইতে চ্যুত হইয়া মহা-নাস্তিক হইয়া পড়ে। এই জন্য সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের 'নগণ্য দাসানুদাস' অভিমান করিয়া উহাদের সুখানুসন্ধানময়ী সেবা করাই প্রকৃত ভক্তি সাধকের একমাত্র কৃত্য, এই প্রকার বিচারে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিলে সাধকের বৈষ্ণব অপরাধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সাধক জীবনের আর একটি প্রধান অন্তরায় "অন্যাভিলাষ" ইহা থাকাকালে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়াও উন্নতি লাভ করা যায় না। ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে অনেক সময় সাধকের মনে 'ভাল খাওয়া' 'ভাল পরা,' 'সুখে জীবন কাটান' অর্থাৎ আরামপ্রিয়তা রূপভক্তি কামনার উদয় হয়। আবার কোন কোন সাধক 'নির্জন ভজনে' ও শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া ভগবৎ সেবাতে বৈরাগ্য প্রদর্শন করে। উহারা নিজ চেষ্টায় মায়ার বিক্রম হইতে 'মুক্তি' পাইতে ইচ্ছা করে। আবার কোন কোন সাধক একদিকে ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতে থাকে। অপরদিকে ভক্তি প্রতিকূল 'অবৈধ যোষিৎসঙ্গ' অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গও চালাইতে থাকে এবং মোহবশতঃ নিজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে না'। আবার কেহ কেহ ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করে মোহবশতঃ নিজের দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করে মোহবশতঃ 'ভগবদ্ বিদ্বেষী নাস্তিক' ও 'নির্বিশেষ বাদীর' সঙ্গ করিতে গিয়া অধোগতি লাভ করে। কেহ বা বাহিরে সাধুত্বের ভান প্রদর্শন করিয়া গুপ্তভাবে বিষয় ভোগাদিরূপ 'কপটতা' আচরণ করে, কেহ বা বৈষ্ণব বেষ ধারণ করিয়াও নিজ শরীরপুষ্টি লাভের জন্য 'অন্য প্রাণীহনন' করিয়া উহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে।

'ভগবৎ ভক্তিযাজনের দ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। বাস্তব মঙ্গললাভে অনভিজ্ঞ, ভোগী মায়াবাদী, অন্যাভিলাষী জনগণের নিকট ইহা কীর্ত্তন না করিলে বাস্তবিক উহাদের প্রতি 'হিংসা' করা হয়। তবে

কৌশল ক্রমে উহাদের গ্রহণোপযোগী করিয়া 'হরিকথা উপদেশ' করিতে হইবে। নতুবা উহারা ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে গন্তব্যস্থান হইতে আরও বহু দূরে পলায়ন করিবে। 'বস্ত্রদান,' 'ঔষধদান,' 'ভূমিদান,' 'স্বর্ণদান,' 'গোদান,' 'অন্নদান,' 'কন্যাদান', 'বিদ্যাদান' প্রভৃতি যত প্রকার উপকারের কথা আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি, এই সমস্ত উপকার অপেক্ষা 'ভক্তিদান' রূপ উপকার সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার সঙ্গে অন্য উপকারের তুলনাই হইতে পারে না। কারণ ইহার ফল অবিনশ্বর, নিত্য, সনাতন, পরমানন্দপ্রদ পুরুষার্থ শিরোমণি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম'। এই বিষয়ে গৌড়ীয়, বৈষ্ণব আচার্যবর্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ নির্ভীক ভাবে উচ্চ কণ্ঠে জগতের নিকট এক বিপ্লবময় মহাসত্যের কথা ঘোষণা করিয়াছেন,—"কোটি কোটি হাসপাতাল করিয়া কোটি কোটি প্রাণীর দেহরোগের চিকিৎসা করা অপেক্ষা একজন মানুষকে পরমপিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের হাত হইতে উদ্ধার করা অধিক মঙ্গল দায়ক ; ইহাকেই প্রকৃত 'পরোপকার' বলা হয়।" এইজন্য প্রত্যেক সাধকের কর্তব্য ভগবদবিমুখ জীবগণকে অধিকার অনুসারে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা, ইহা না করিলে জীবের প্রতি হিংসা করা হয়।

কোন কোন সাধকের মনে আখেরের চিন্তা প্রবল হওয়ায় উহারা গোপনে গোপনে অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে। ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্বদা যাঁর পদসেবা করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, সেই নারায়ণের সেবা যাঁহারা করেন তাহাদের কি কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে পারে ? "অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন," ভক্তি সাধকগণ এই বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, উহাদিগকে আর অনিত্য অর্থসঞ্চয়ের কুচেষ্টা করিতে হয় না।

কোন কোন সাধক অপরের নিকট হইতে "সম্মান" "পূজাদি" পাওয়ার জন্য উহাদের মনোধর্মের যোগান দিতে থাকে, এই লোক ভজার বৃত্তি ভক্তিপথের

বিশেষ অন্তরায়। শুদ্ধ ভক্তগণ 'লোকভজা' বা লোকরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জীবের বাস্তব মঙ্গলের জন্য নির্ভীক সত্য কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

'প্রতিষ্ঠাকামনা' সাধকগণের সিদ্ধিলাভের পথে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। অনেক সময় সাধকগণ চমৎকার বক্তৃতা করে, সুকণ্ঠে কীর্ত্তন করে, শ্রীবিগ্রহের সুন্দর শৃঙ্গারাদি করে, মঠ মন্দিরাদি নির্মাণে অধিক অর্থ সংগ্রহ করে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ কবিতা রচনা করে, লোকপ্রিয় গ্রন্থ প্রণয়ন করে এবং আরও অনেক কিছু আড়ম্বর পূর্ণ সেবা করে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করে।

"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।"

সৎসাধকগণের নিকট আগত যাবতীয় 'প্রতিষ্ঠা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপরই অর্পণ করেন। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধক ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায় বৈষ্ণবাপরাধ ও লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি অন্যাভিলাষ হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া ভজন পথে অগ্রসর হইবেন। এতদ্ব্যতীত ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাদি ও অসৎসঙ্গ বর্জিত হইয়া নিজেকে দীন হীন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমানে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানময়ী সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিবেন। তাহা হইলে তাঁহার শীঘ্রই ভক্তিপথে প্রগতি হইবে।

ষড়্‌বেগজয়ী শ্রীভগবদ্ভক্তই জগদ্‌গুরু

অতি সৌভাগ্যবান্ মনুষ্যেরই ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখতা লাভ হয়। এবং তাহারই সদ্গুরু আশ্রয়ের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে তিনি কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে থাকেন। উহার ফলে তাঁহার শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ভগবদ্ বিষয়ে অনুভব হইতে থাকে। গুরু বৈষ্ণবগণের অকপট আনুগত্যে সেবা করিবার ফলে অচিরেই তিনি প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারেন। কিন্তু প্রাক্তন কর্মবশতঃ তিনি যদি ষড়্‌বেগাদি অনর্থ সমূহ দমনের জন্য বিশেষ যত্ন না করেন, তবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের অভিনয় করিতে থাকিলেও প্রেমানন্দ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র রসও আস্বাদন করিতে সমর্থ হবেন না। বহির্ম্মুখ লোকের নিকট হইতে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা পাইতে থাকিলেও অনর্থ প্রাবল্য বশতঃ নিজে কিছুতেই ভগবদ্ বিষয়ের কোন অনুভূতি লাভ করিতে পারেন না।

ষড়্‌বেগ ভক্তিসাধককে সিদ্ধিলাভে বিশেষ বাধা প্রদান করে। বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ষড়্‌বিধ বেগ জয় করিতে না পারিলে সাধক কোন মতেই 'প্রেম' লাভ করিতে পারে না। আর যে ভক্ত ষড়বেগের প্রকোপ সহ্য করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ ভজন করেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই "জগদ্গুরু" পদবাচ্য হন।

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

যে ভজনাকাঙ্খী সাধক এখনও ষড়বেগ জয় করিতে পারে নাই, অথচ ভগবদ্ ভজনের প্রবল আকাঙ্খা আছে; তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের অকৃত্রিম আনুগত্যে বিশেষ যত্ন পূর্বক উহাদের সেবা করিতে থাকিলে, উহাদের কৃপায় অতি শীঘ্রই ষড়্‌বেগজয়ী হইয়া থাকেন।

ষড়বেগের প্রকোপ এবং উহা দমনের উপায়ঃ—

(১) কৃষ্ণেতর আলাপনকেই "বাক্যবেগ" বলে। কর্মিগণের স্বসুখমূলক সৎ বা অসৎ আলাপন এবং জ্ঞানিগণের নির্বিশেষমূলক শাস্ত্রীয় আলোচনাকেও "বাক্যবেগ" বলা হয়। ভূতোদ্বেগকারী—বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিশ্বে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ, কলহ-লড়াই, হিংসা-দ্বেষ, রক্তারক্তি, এমন কি প্রাণ-বিনাশ আদিও সংঘটিত হইয়া থাকে। শত্রু-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ বাণ অঙ্গে বিদ্ধ হইলে যেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়, অপরের বাক্যবাণে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইলে উহা হইতেও অধিকতর কষ্টদায়ক হয়। ঐ জ্বালা জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত অন্তঃ-করণ হইতে বিদূরীত হইতে চাহে না। মুখ হইতে একবার ভূতোদ্বেগমূলক বাক্য বহির্গত হইলে উহাকে আর ফিরাইয়া আনা যায় না। এইজন্য বুদ্ধিমান সাধক বিশেষ যত্নপূবক কৃষ্ণেতর "বাক্যবেগ" সহন করিতে চেষ্টা করেন।

শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট ভগবৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাসূচক কথা কীর্ত্তন করিলে উহাকে বাক্যবেগ বলে না। হরিকীর্ত্তনই বাক্যবেগ দমনের প্রকৃষ্ট উপায়।

(২) অসদ্ বিষয়ের সংকল্প করাকেই "মনোবেগ" বলে। চঞ্চল মন কখন 'এটা' করিতে চায়, কখনও বা 'ওটা' করিতে চায়। এই দুর্জ্জয় মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন। সদ্গুরু প্রদর্শিত ভগবল্লীলা কথা নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে মনোবেগকে সহজেই জয় করা যায়। শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাতে মনকে সদা নিমগ্ন করাই "মনোবেগ" সহনের সার্থকতা।

(৩) স্বসুখ পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। উহাকেই

"ক্রোধবেগ" বলে। ক্রোধ জীবের একটা মহাশত্রু। যখন কেহ ক্রোধাক্রান্ত হয়, তখন গুরুজনগণের প্রতিও গুরুতর অমর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া সে মহাপরাধের ভাগী হইয়া পড়ে। তখন ঐ ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ থাকায় অপরের সহিত কলহ-মারামারি করে, এমনকি অপরের প্রাণ বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; কখন বা নিজের শরীরকেও ধ্বংস করিয়া বসে।

ক্রোধী ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। এইজন্য ভক্তি সাধকের অতি যত্নের সহিত এই ক্রোধবেগকে দমন করা উচিত। 'হরি', 'গুরু', 'বৈষ্ণব' ও ভক্তির প্রতি যারা অমর্য্যাদা করে, তাহাদিগকে ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে ক্রোধবেগের সদ্ব্যবহার করা হয়। "ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে"—ইহাই মহাজনগণের উপদেশ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণপ্রিয়া শ্রীসীতাঠাকুরাণীকে রাবণ দুষ্টাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া অপহরণ করায় রামভক্ত হনুমান রাবণের সোনার লঙ্কাকে ভস্মীভূত করিয়া সবংশে তাহাকে বিনাশ করাইয়া ছিলেন। ভগবদ্ বিদ্বেষী রাবণকে দলন করিয়া ভক্ত হনুমান ক্রোধবেগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(৪) মুখরোচক দ্রব্য ভোজন করার প্রবৃত্তিকেই 'জিহ্বাবেগ' বলে। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অমেধ্য, কুমেধ্য, এমনকি লোভজনক সাত্ত্বিক দ্রব্য ভক্ষণ করাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। মধুর অম্ল কুট-লবণ-কষায়-তিক্ত খাদ্যদ্রব্যকে ষড়্‌রস বলে। জীব এই ষড়্‌রসের বশীভূত হইয়া মৎস ভক্ষণ করে, পশু বধ করিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করে, ধুম্রপান ও মদ্যপান করে এবং অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ করিয়া কু-অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে।

জিহ্বাবেগের প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবৎ উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিতে হয়। "প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়"। ইহা ছাড়া জিহ্বাবেগের দমনের আর কোন উপায় নাই। তবে নিজ জড়ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি ছলে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে অপরাধের

সঞ্চার হইয়া থাকে। উহাতে জিহ্বা বেগদমিত হয় না। এইজন্য জড়ভোগ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা-শিবমান্য মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিলেই কৃষ্ণপ্রেমলাভের সৌভাগ্যোদয় হইবে। জিহ্বাবেগ ও অনায়াসে দমিত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫) জিহ্বাবেগগ্রস্ত ব্যক্তিই সাধারণতঃ উদরবেগগ্রস্ত হইয়া থাকে। অধিক ভোজন স্পৃহাকেই "উদরবেগ" বলে। মুখরোচক দ্রব্য খাইতে গিয়া উদরবেগ-গ্রস্ত ব্যক্তির অধিক ভোজন হইয়া পড়ে, ফলে তাহাকে নানাবিধ রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতে হয়।

একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মাধবতিথি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে উপবাস পূর্ব্বক পালন করিতে পারিলে উদরবেগ প্রশমিত হয়।

(৬) জিহ্বাবেগ হইতেই উদরবেগ বৃদ্ধি হয় এবং উদরবেগ হইতেই উপস্থ বেগের প্রকোপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ স্পৃহাকেই "উপস্থবেগ" বলে। উপস্থবেগগ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য মহা-মহাপাপ কার্য্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। ঐজন্য তাঁহার সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য আদি সমস্ত গুণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ"॥

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যেরূপ মোহ বন্ধ হয়, অন্য কোন বস্তুর সংযোগে জীবের সেরূপ মোহ হয় না। এইজন্য গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে ভোগোপযোগী স্ত্রীলোকের সহিত অধিক মেলামেশা বার্ত্তালাপ বা অবৈধ প্রীতির আদান প্রদান করা অত্যন্ত অন্যায়। বদ্ধজীব স্বভাবতঃ বিষয়াকর্ষণে আকৃষ্ট হয় এবং পরিণামে-মায়ার কঠিন বন্ধনে চিরবদ্ধ হইয়া পড়ে'।

"তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ"॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত 'প্রেমবিবর্ত' গ্রন্থে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।" এইজন্য সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত স্ত্রী-সঙ্গ পিপাসাকে বা উপস্থবেগের প্রকোপকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিবে। হৃদয়ে "কৃষ্ণসেবাকাম"কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে 'জড়কাম' হৃদয় হইতে অতি সত্বর পলায়ন করিবে।

এইজন্য যাহারা ষড়্বেগের প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে আকাঙ্খা করে, তাহাদিগকে সর্বদা হরিসেবায় ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ভক্তির অনুকূল কার্য্যসমূহ যে প্রকার প্রীতির সহিত অনুশীলন করা দরকার, সেই প্রকার ভক্তির প্রতিকূল ষড়্বেগকে বিশেষ যত্নসহকারে দমন করা প্রয়োজন। অন্বয় ব্যতিরেকভাবে ভক্তি যাজন করিতে পারিলেই উহার প্রকৃষ্ট ফল "প্রেমানন্দ" অনুভব করা যায়।

বাহ্যদৃষ্টিতে ষড়্বেগজয়ী ভক্ত গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসী হইলেও তিনি রাজাধিরাজবৎ পূজ্য "মহারাজ"। দীনবৎ দুষ্ট হইলেও তিনি প্রেম-মহাধনে ধনী "মহাজন"। তাঁহার শারীরিক বলের অভাব বোধ করা গেলেও তিনি ভগবৎ কৃপাশক্তি প্রভাবে "মহাবীর" নিজেকে অমানীজ্ঞানে কাহার নিকট হইতে সম্মান-বা পূজা না চাহিলেও ভগবান্‌কে স্বীয় হৃদয়ে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখায় তিনিই সর্বজন পূজ্য জগদ্গুরু পদবাচ্য। রাজা স্বীয় দেশে বর্ত্তমান কালে অনুগত প্রজাগণেরই পূজ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু ষড়্বেগজয়ী ভগবদ্ভক্ত সর্বদেশ, সর্বকালে "সর্বজন পূজ্য" বলিয়া স্বীকৃত হন। জাগতিক রূপ-বল-ধন-বিদ্যা-গর্বে গর্বিত মহাদুষ্ট-প্রকৃতিজনও তাঁহার সম্মুখে অবনত মস্তক হইতে বাধ্য হয়। তাঁহার ভগবৎ প্রদত্ত অপ্রাকৃত বলের নিকট উহাদের যাবতীয় বলই ক্ষীণপ্রভা হইয়া পড়ে। এইজন্য তিনিই বিশ্ববাসী সকলকে শাসন করিবার সুযোগ্য পাত্র।

দুস্তরা বিষ্ণু মায়াকে জয় করিবার উপায়

মায়াবদ্ধ জীবগণ ইহ সংসারে রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি, দুঃখ-দারিদ্র, কলহ-লড়াই প্রভৃতি ত্রিতাপে জর্জরিত হইয়া অশান্তিময় জীবন যাপন করিতেছে। ঐ সমস্ত তাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উহারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টান্বিত হইতেছে এবং সুখলাভের জন্য নবনব প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে কিছু ক্ষণিক সুখ প্রাপ্ত হইলেও পরমুহূর্তেই দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকারে অনাদিকাল হইতে দুঃখভোগ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তু গঙ্গা-তুলসী-ভাগবত ও ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে কিছু কিছু সুকৃতি অর্জন করিতে থাকে। ঐ সুকৃতি পুঞ্জিভূত হইলে সাধুসঙ্গে আদর হয় এবং ক্রমশঃ সাধুর উপদেশ সমূহ পালন করিতেও ভাল লাগিতে থাকে। ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কখন কখন শ্রদ্ধা পূর্বক উহাদের সেবা করিতে থাকে। এই প্রকারে নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতে যখন তাহাদের চিত্ত নির্মল হইতে থাকে, তখন ভগবৎ কৃপায় কোন শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ জিতেন্দ্রিয় ভগবৎ নিজজন শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্যোদয় হয়। তদন্তর ঐ গুরু-পদাশ্রিত শরণাগত ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে, ভগবদভিন্ন বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জ্ঞানে নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ বশীকরণ যোগ্য নিম্নলিখিত "ভাগবতধর্ম" সমূহ শিক্ষা করেন :—

(১) দেহ ও গেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিতে অনাসক্ত হইতে শিক্ষা করেন। ইহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও পান্থশালায় যাত্রীগণের সঙ্গে অবস্থানের ন্যায় অনাসক্ত থাকেন।

(২) গুরু বৈষ্ণবগণকে প্রীতির সহিত সেবা করেন।

(৩) দীন-দুঃখী পতিত অজ্ঞানজনকে অধিকার অনুরূপ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগের প্রতি "দয়া" প্রদর্শন করেন।

(৪) সমজাতীয়াশয় ভক্তগণের সহিত "মিত্রতা" স্থাপন করেন।

(৫) উত্তমাধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবকে বিনয়াবনত মস্তকে সেবা করেন।

(৬) প্রতিদিন প্রাতঃ স্নানাদির দ্বারা শরীরকে এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি বর্জিত হইয়া চিত্তকে পবিত্র রাখেন।

(৭) সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্ণাশ্রম উপযোগী ধর্মসমূহ ভক্তির অনুকূলে পালন করেন।

(৮) নিজেদের প্রতি কেহ কোন দুর্ব্যবহার করিলে উহা সহ্য করিয়া উহাকে ক্ষমা করেন।

(৯) বিষয় বার্ত্তা হইতে বিরত।

(১০) অধিকারানুরূপে গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র নিত্য অনুশীলন করেন।

(১১) কপটতা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সরল রাখেন।

(১২) ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমবাসী স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, এবং গৃহস্থগণ পুত্রার্থ ভিন্ন স্ত্রী সহবাস করেন না।

(১৩) প্রাণী মাত্র কাহার দ্রোহ বা হিংসা আচরণ করেন না।

(১৪) সুখ-দুঃখে বা হর্ষ বিষাদে সর্ব্বাবস্থায় চিত্তকে শান্ত রাখেন।

(১৫) নিরন্তর ভগবদনুশীলন করেন।

(১৬) একান্তশীল হইয়া অবস্থান করেন।

(১৭) ঘর-বাড়ী-দালান কোঠার আসক্তি ত্যাগ করেন।

(১৮) ভাল পোষাক আদির জন্য লালায়িত না হইয়া অনায়াস লব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন।

(১৯) ভগবৎ প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত গীতাদি শাস্ত্রে অটুট শ্রদ্ধা রাখেন।

(২০) অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করেন না।

(২১) চঞ্চল মনকে সংযম করেন।

(২২) প্রজল্প ও মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া হরিকীর্তন দ্বারা 'বাক্যবেগ'কে দমন করেন।

(২৩) পাপকর্ম হইতে সর্বদা দূরে থাকেন।

(২৪) সত্যবাণী কীর্তনে নির্ভীক হন।

(২৫) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখেন।

(২৬) সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা ও মহিমার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণের অভ্যাস করেন।

(২৭) বিষয়ীগণ বিষয়সুখ লাভের জন্য যেমন বিপুল চেষ্টা করে, উহারাও সেইরূপ ভগবৎ সন্তোষের জন্য অখিল চেষ্টা করেন।

(২৮) উহারা শ্রীকৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্যেই বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অর্থ বা দ্রব্যাদির দান, একাদশী চাতুর্মাস্যাদি ব্রতপালন, মন্ত্রাদির জপ ও সদাচার আদির পালন করেন।

(২৯) নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক খাদ্য-দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ সেবায় অর্পণ করেন।

(৩০) স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি স্বজনগণকে এবং নিজেকে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত রাখেন।

(৩১) শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের সহিত প্রীতির ব্যবহার করেন।

(৩২) বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থাবর এবং মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি জঙ্গম প্রাণীতে ভগবৎ অধিষ্ঠান জানিয়া উহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিশ্রেষ্ঠ। আবার ধর্ম্ম পরায়ণগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"।

সুতরাং কৃষ্ণভক্তগণের সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাদের সেবা করেন।

(৩৩) ভক্তগণসহ কৃষ্ণ কথা আলাপন করিয়া আনন্দ আস্বাদন করেন।

(৩৪) কৃষ্ণসেবানন্দকে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া উহাদের অনুভূত হওয়ায় ভক্তিবিরোধী স্ত্রী সম্ভোগ আদি তুচ্ছানন্দের অসারতা উপলব্ধি করেন।

(৩৫) সাধন ভক্তিকে অবলম্বন করিয়াই প্রেমভক্তি লাভের যত্ন করেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি অন্য কোন সাধনের চেষ্টা করেন না। ঐকান্তিক সাধনফলে যখন প্রেমভক্তির উদয় হয়, তখন অশ্রু-কম্প-পুলকাদিরূপ আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। "কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিতেছেন না"—বলিয়া কখন প্রেমাবেশে ক্রন্দন করেন। 'কৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি হইয়াও গোপগৃহে মাখন চুরি করিতেছেন'—প্রেমাবেশে ইহা দর্শন করিয়া কখনও হাস্য করেন, কখন তাঁহার অলৌকিকভক্তবাৎসল্য লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন "প্রভো! এতদিন পরে তুমি আমাকে দর্শন দিলে"—বলিয়া কখন ভাবে গদ্‌গদ্ হইতে থাকেন। কখন পাগলের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখনও বা ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহ অভিনয় করিতে করিতে কৃষ্ণসেবানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন।

এইরূপে গুরুসেবকগণ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অধিকন্তু পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবালাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥

(ভাঃ ১১।৩।৩৩)

এই ভাগবত ধর্ম্ম ভৃগু আদি ঋষিগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবগণ, সিদ্ধগণ,

অসুরগণ এবং মনুষ্যগণও জানিতে পারে না। যাহাদের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা হয় তাহারাই জানিতে পারেন।

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনকরাজা, ভীষ্মদেব, বলিমহারাজ, শুকদেব গোস্বামী ও যমরাজ—এই দ্বাদশজন মহাজন এবং ইহাদের অনুগ বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত আচার্য্যগণই এই ভাগবত ধর্ম জানিতে পারেন।

"ধর্ম্মান্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং নবৈ বিদু ঋষয়োঃ নাপি দেবাঃ"।

যে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে এ জগতে অবতার গ্রহণ করেন, তাহাকেই 'ভাগবত' ধর্ম বলে। এই ধর্ম 'নির্মল', গুহ্য ও দুর্বোধ্য, ইহা জ্ঞাত হইলে জীবের পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"

এই ধর্ম সর্ব প্রাণীর গ্রহণোপযোগী।

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঙ্গ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৪-৩৫)

ভগবান্ অজ্ঞ জনগণেরও অনায়াসে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাকেই "ভাগবত ধর্ম" বলিয়া জানিবে। এই ধর্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন কর্তৃক ধাবিত হয় না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নেত্র নিমীলন পূর্বক ধাবিত হইলে যেরূপ স্খলিত হইবার ভয় থাকে না। সেইরূপ ভাগবত ধর্ম্মের আশ্রয়কারী ভক্ত দৈবাৎ কোন পাপকর্ম করিলেও ভগবান্ তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

জ্ঞানীগণ নিজেদের চেষ্টায় দৈবীমায়াকে জয় করিয়াছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি ভগবৎ সেবায় প্রতিষ্ঠিত না থাকায় অধঃপতিত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানীগণ নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিলেও ভগবানে ভক্তিশূন্য হওয়ায় বিমুক্ত হইতে পারে না। তাই উহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। কারণ উহারা অনেক ক্লেশ করিয়া পরমপদ 'ব্রহ্ম' পর্যন্ত আরোহন করিয়াও ভগবৎ ভক্তির অনাদর করায় অধঃপতিত হয়।

এইজন্য জ্ঞানীগণ যতদিন ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ করিতে না পারে, ততদিন উহারা মায়াজয় করিতে পারে না। এখন বিষয়াসক্ত ভোগী জীবের কথায় আসা যাউক।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যাবৎ মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহাদিগের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, সংসার বাসনাও অপগত হয় না।

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জ্ঞানী, যোগী, কর্মী এমনকি বিষয়াসক্ত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষও বিশুদ্ধ ভক্তিলাভ করিয়া দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অধিকন্তু কৃষ্ণবশীকারিণী প্রেমভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হন।

সেবাই নিয়ম

বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন পরমার্থ জীবনের প্রারম্ভিক ও নিম্নতম সোপান। বিষ্ণুর সঙ্গে সংযোগ রেখে বর্ণাশ্রমিগণ স্ব-স্ব অধিকার অনুসারে সাংসারিক সুখাদি ভোগ করেন। এই প্রক্রিয়ায় বিষয়ভোগ অতি সহজেই সুন্দররূপে লভ্য হয়। নিজ নিজ বল বা চেষ্টা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা পূরণ করতে গেলে অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পশু-পক্ষিগণ বিষ্ণুর সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে পারে না; তাই বিষয়ভোগ করতে গিয়ে পরস্পর কামড়া-কামড়ি মারামারি করে দুঃখ পায়। বর্ণাশ্রমের অধিদেবতা শ্রীবিষ্ণুকে বাদ দিয়ে বিষয়ভোগ করতে গেলেই বাদ বিবাদ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বর্ণাশ্রমধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করেও যদি বিষ্ণুর ভজন না করে, তবে তা'দিগকে নরক যন্ত্রণা অবশ্য ভোগ করতে হয়।

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

বিষ্ণুর সন্তোষমূলক সেবায় গৌণবুদ্ধি হইলে বিষয়ভোগ প্রবৃত্তি প্রবল হয়। তখন ভোগ লোলুপ মনুষ্যগণ মনে করে, "এখন বিষয়সুখ উপভোগ করে বৃদ্ধ কালে একাগ্রচিত্তে ভগবৎ সেবা করব।" কিন্তু ঐ সময় সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ সেবা সম্ভবপর হয় না। কারণ বৃদ্ধকালে সমস্ত ইন্দ্রিয় অপটু হয়ে পড়ায় আর ভগবৎ সেবা করতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ কালবিলম্ব না করেই অতি সত্বর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁহার শিক্ষানুসারে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা আরম্ভ করেন,

"জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।

কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন ,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই ।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥”

শ্রীভগবৎসেবায় আত্মসুখের লেশ থাকা উচিত নয়। বর্ণাশ্রম ধর্মে আত্ম-সুখের গন্ধ থাকে বলে মহাপ্রভু উহাকে ‘বাহ্য’ বলেছেন এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ ভক্তির আচরণ করতে শিক্ষা দিয়াছেন।

“এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ ॥ ”

ভগবৎ সেবার জন্য কিছু শারীরিক কষ্টভোগ করতে হলেও ভক্তগণ দুঃখ অনুভব করেন না। কারণ সেবার মধ্যে প্রচুর আনন্দের আস্বাদন আছে। বড়-বড় ধনী ও মানী পণ্ডিতগণ সেবানন্দের আস্বাদন পেয়ে বিষয়ানন্দের কথা ভুলে যান। ভক্তগণ ভগবৎ সেবার জন্য পাপ বা অপরাধকে ভয় করেন না। এমন কি অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতেও ভীত হন না।

সেবার উজ্জ্বল আদর্শ মহাপ্রভুর এক ভক্ত শ্রীগোবিন্দের জীবনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। একদিন প্রাতঃকালে নীলাচলে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শয্যোত্থান দর্শন করিতে গেলেন। দর্শনান্তে ভক্তগণকে নিয়ে সাতটি সম্প্রদায় রচনা করে তথায় বেড়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীসত্যরাজ খান, ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর এই সাতজন এক এক সম্প্রদায়ে নৃত্য করতে লাগলেন। অন্যান্য ভক্তগণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন। গগনভেদী সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে নীলাচল বাসী তথায় ছুটে আসলেন। ভক্ত-

গণের উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী টলমল করে উঠলো। শোতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে আনন্দে-সম্মিলিত কণ্ঠে হরিধ্বনি করতে থাকায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। মহাপ্রভু প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কখন কখন গমন করে ভক্তগণকে আনন্দ দান করতে লাগলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণই অনুভব করতে লাগলেন যে, মহাপ্রভু তাঁদের কীর্তন মণ্ডলীতে সর্বক্ষণ অবস্থান করছেন। মহাপ্রভুর যখন নৃত্য করবার ইচ্ছা হলো,তখন সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘিরে বেড়া কীর্ত্তন করতে লাগলেন। আর তিনি প্রেমাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি বাহুতুলে উচ্চৈঃস্বরে 'বোল' 'বোল' ধ্বনি করিতে লাগলেন। ভক্তগণ সেই সময়ে তুমুল রবে হরিধ্বনি দিতে দিতে প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। এই সময় মহাপ্রভুও প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন। কিছু সময় পরেই হুঙ্কার করে আবার উঠে পড়লেন। তাঁর সমস্ত শরীরে অত্যদ্ভূত অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশিত হলো। ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন করতে করতে বেলা তৃতীয় প্রহর হলো এবং সকলেরই দেহ গেহ স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কীর্ত্তনীয়াগণকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৌশল করে একে একে তাদিগকে সেখান হতে সরায়ে দিতে লাগলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর সঙ্গে সাত সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়াগণ ধীরে ধীরে কীর্ত্তন করতে লাগলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি লঘু হওয়ায় মহাপ্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হলো। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণের পরিশ্রমের কথা মহাপ্রভুর নিকট জানালে তিনি নৃত্য কীর্ত্তন সমাপন করলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নান করে মহাপ্রসাদ সেবা করলেন; তারপর সকলকে বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ গম্ভীরার ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারলেন না, সমস্ত দ্বারদেশ জুড়ে শুয়ে পড়লেন। প্রতিদিন রাত্রে মহাপ্রসাদ সেবনান্তে গম্ভীরায় শয়ন করলে সেবক শ্রীগোবিন্দ তাঁহার পাদ

সম্বাহন করতেন। মহাপ্রভু নিদ্রিত হলে গোবিন্দ প্রসাদ পেতে যেতেন। অন্যদিনের ন্যায় গোবিন্দ সেদিন পাদসম্বাহন করতে এসে দেখলেন,—"মহাপ্রভু দরজা জুড়ে শয়ন করে আছেন। তিনি কোন মতেই পাদসম্বাহন করতে ভিতরে যেতে পারলেন না। তখন বিনীত ভাবে মহাপ্রভুকে বললেন, —"প্রভো। কৃপা করে পাশ ফিরে শয়ন করুন; আমাকে পাদসম্বাহনের জন্য ভিতরে যেতে দিন।" তদুত্তরে মহাপ্রভু বললেন, "আজ আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি—পাশ ফেরার শক্তিও আমার নাই। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।" বার বার অনুরোধ করা সত্বেও যখন মহাপ্রভু পাশ ফিরলেন না, তখন গোবিন্দ স্বীয় বহির্বাস মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর বিছায়ে মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক গম্ভীরার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পাদদেশাদি মৃদু মধুর ভাবে মর্দন করতে লাগলেন। তাহাতে মহাপ্রভুর পরিশ্রমের লাঘব হতে লাগলো এবং তিনি সুখে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

ঘণ্টাধিককাল গাঢ় নিদ্রার পরে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলো। তখনও পর্য্যন্ত গোবিন্দকে অনাহারে তথায় উপবিষ্ট থাকতে দেখে মহাপ্রভু ভর্ৎসনা করে বললেন—"এখনও তুমি এখানে বসে আছ কেন? আমি নিদ্রিত হলে প্রসাদ পেতে যাও নাই কেন?"

গোবিন্দ বললেন,—আপনি দরজা জুড়ে শুয়ে আছেন, বাহিরে যাবার পথ না থাকায় যেতে পারি নাই।" একথা শুনে শ্রীমহাপ্রভু বললেন, "যে প্রকারে ভিতরে এসেছিলে, সেই প্রকারে বাহিরে গেলে না কেন?"

গোবিন্দ এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নিস্তব্ধ থাকলেন এবং মনে মনে বল্‌তে লাগলেন, "মহাপ্রভুর যাতে সুখ হয়, তাহাই আমার একমাত্র কর্তব্য। নিজের সুখ-দুখ, পাপ-পুণ্য, ও অপরাধের দিকে দৃষ্টি না করে শ্রীগৌরসুন্দরের সুখানুসন্ধান করাই আমার কর্ত্তব্য। তাঁহার সুখানুসন্ধান করতে গিয়ে যদি আমার কোটি কোটি পাপ ও অপরাধ ভোগ করতে হয় কিংবা নরকে যেতে

হয়, তাতে আমি ভীত নহি। মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করার অপরাধ বশতঃ নরক যন্ত্রণা ভোগ করব, তাতেও আমি ভয় পাই না। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ সম্মর্দনে তিনিও সুখী হলেন, এতেই আমার আনন্দ, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি বিধান করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজের সুখের জন্য অপরাধের আভাসকেও ভয় করি।

"গোবিন্দ কহে মনে—"আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক, কিংবা, নরকে গমন ॥
সেবা লাগি কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥"

গোবিন্দ মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনরূপ সেবার জন্য তাঁকে উল্লঙ্ঘন করে গম্ভীরার ভিতরে প্রবেশ করলেন। উহার জন্য অপরাধের ভয় করলেন না। কিন্তু 'অন্নব্রহ্ম' মহাপ্রসাদের সেবা করবার জন্য শ্রীমহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করে গম্ভীরার বাইরে আসলেন না। কারণ মহাপ্রসাদের সেবার মধ্যে আত্মসুখের কিছু আভাস আছে। তাই তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করে প্রসাদ সেবা করতে গেলেন না, অনাহারে বসে থাকলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু গোবিন্দের মনোভাব অবগত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। গোবিন্দ শুদ্ধ সেবার সর্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করলেন।

সেবার মধ্যে স্ব-সুখের আভাস থাকলেও ভক্তগণ উহাকেও আদর করেন না। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের আদর্শে উহা পরিস্ফুট হয়েছে।

এক সময় শ্রীল পুরীপাদের রেমুনায় শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে শুভবিজয় করেছিলেন। সেখানে শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা ভোগরাগের পরিপাটি দেখে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, শ্রীগোপীনাথজীর অমৃত কেলি ক্ষীর-প্রসাদ যদি অযাচিত ভাবে একটু আস্বাদন করতে পারি, তবে ঐরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করে গোবর্দ্ধনের শ্রীগোপাল দেবজীকে ভোগ লাগাতে পারি।

এই প্রকার ভগবৎ সুখানুসন্ধানময়ী সেবার মধ্যেও কিছু গন্ধ থাকায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ উহাকেও অপরাধ মূলক কার্য জ্ঞানে "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ করতে লাগলেন।

অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল।
হেন কালে ভোগ সারি' আরতি বাজিল॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে॥"

প্রেমানন্দই শ্রেষ্ঠ আনন্দ

এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী হতে আরম্ভ করে ব্রহ্মাদি দেবতা পর্যন্ত সকলেই আনন্দ পেতে চায়, কেহই দুঃখভোগ করতে চায় না, আনন্দ উপভোগ ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য জীবগণ সর্বদা ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে আছে; কিন্তু 'আনন্দ' লাভের পরিবর্তে প্রায়ই 'দুঃখ' লাভ করে থাকে।

"কর্মাণ্যারভমানানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥"

জীবগণ দুঃখ নিবৃত্তির এবং সুখ প্রাপ্তির জন্য একত্র হয়ে কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সর্বদা বিপরীত ভাব ঘটে থাকে অর্থাৎ সুখলাভের পরিবর্তে দুঃখপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

কখন কখন জীবগণ ক্ষনিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়, উহাতে উহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারে না। সেইজন্য সর্বক্ষণ আনন্দের অনুসন্ধান করতেই থাকে। অনন্ত জীবগণকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়, (১) মনুষ্যেতর জীবগণ, (২) অসভ্য অনৈতিক নাস্তিক নরগণ, (৩) সভ্য নৈতিক নাস্তিক নরগণ, (৪) নৈতিক আস্তিক নরগণ, (৫) সাধক ভক্তগণ ও (৬) প্রেমিক ভক্তগণ।

সাধক ভক্তগণ ও প্রেমিক ভক্তগণ যে আনন্দ অনুভব করেন, উহাই নিরবছিন্ন বিশুদ্ধ নিত্যানন্দ। ইহারা সেবার দ্বারা ভগবানকে আনন্দিত করেন এবং নিজেরাও আনন্দলাভ করেন। এই আনন্দকেই 'প্রেম' বলে।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম নাম ॥"

এই প্রেমানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। পূর্বোক্ত ছয় প্রকার জীবের আনন্দের তারতম্য বিচার করা যাইতেছে।

(১) মনুষ্যেতর জীবগণের মধ্যে তৃণ-গুল্ম-লতা-বৃক্ষাদি জীবগণ আলো ও মুক্ত বাতাস লাভ ক'রে আনন্দ পেতে চায়। এককে পেষণ করে অন্যে সুখী হতে চায়, পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গ পরস্পরকে হিংসা করে নিজেরা আনন্দ পেতে চায় ; কিন্তু এক প্রাণীর অপর প্রাণী হতে মৃত্যুভয় থাকায় কেহ সুখী হতে পারে না।

(২) অসভ্য অনৈতিক নাস্তিক নরগণ নিজ নিজ সুখের জন্য পশুপক্ষীর ন্যায় পরস্পর হিংসা-দ্বেষ কলহাদি করে অশান্তি ভোগ করে। ইহারা সর্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে বিশ্বাস করে না, নিজ নিজ পাশবিক বল ও দুর্নৈতিক কার্য্যের দ্বারা সুখী হতে চেষ্টা করে ; কিন্তু প্রকৃত সুখী হতে পারে না।

(৩) সভ্য নৈতিক নাস্তিকগণ জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের 'প্রভুত্ব' ও 'সর্বশক্তি-মত্তা' কে স্বীকার না করে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানের শক্তিতে

নির্ভর ক'রে সুখী হতে চায়। জগৎস্রষ্টা ও জগতের পালয়িতা শ্রীজগন্নাথের প্রতি কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা বা আনুগত্য স্বীকার করতে চায় না। ইহাই উহাদের দুঃখের মূল কারণ—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

পরমেশ্বরকে ও তার প্রবর্ত্তিত ধর্মকে অস্বীকার করায় ইহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায় না।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো,
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

উহারা জড়বিজ্ঞান বলে মারণাস্ত্রাদি প্রস্তুত ক'রে অন্য দেশ ও অন্য জাতিকে পদানত করে সুখী হতে চায়। কিন্তু অপরের প্রতি 'প্রভুত্ব' বিস্তার করতে গিয়ে নিজেরা অপরদেশ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় সর্বদা সন্ত্রস্থ হয়ে থাকে। এইজন্য উহারা বহির্দৃষ্টিতে বহু উন্নত বলে প্রতীয়মান হলেও সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্থ থাকে। আনন্দের বদলে নিরানন্দই ভোগ করতে থাকে।

(৪) নৈতিক আস্তিক নরগণ হতেই প্রকৃত মনুষ্য জীবনের আরম্ভ হয়। ইঁহারা সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন। অনৈতিক ও অধর্ম কোন কার্য করতে ভয় পান। কিন্তু সাধ্য সাধন নির্ণয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করতে না পারায় নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের আরাধনা করতে পারেন না। গঙ্গাস্নান, তীর্থভ্রমণ, অতিথি সৎকার, দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র দান, দেবদেবীর পূজন, বর্ণাশ্রম ধর্মপালন, ভাগবত-শ্রবণ, সাধুসেবন প্রভৃতি পুণ্যকর অনুষ্ঠান বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত যাজন করেন। বিভিন্ন প্রকার ধর্মসভায় সম্মিলিত হয়ে ধার্মিক প্রবচন আদি শ্রবণ ক'রে আনন্দ অনুভব করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একনিষ্ঠ হয়ে কোন

ভক্তের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য হয় না। একনিষ্ঠ বৃত্তিকে উঁহারা গোড়ামী বলেই মনে করেন। যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা কোন বিশুদ্ধ ভক্তের চরণ আশ্রয়ের সৌভাগ্য বরণ করতে না পারেন, ততদিন উঁহারা ভগবদারাধনায় একনিষ্ঠতা লাভ করতে পারেন না এবং প্রকৃত আনন্দের সন্ধানও পেতে পারেন না।

(৫) সাধক ভক্তগণ প্রাক্তন সুকৃতির ফলে ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি (১) শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভগবৎ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীগুরু-কৃপা ছাড়া কেহই ভগবৎ কৃপা লাভ করতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব মনুষ্যাকারে পরিদৃষ্ট হলেও তিনি মনুষ্য নহেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন। সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য তিনিই অবগত আছেন, ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার করতলগত এবং ভগবানকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করেছেন। এই প্রকার (২) সাধুর বা সদ্‌গুরু আশ্রয় করলেই পরম মঙ্গল লাভের সৌভাগ্য হয়।

''তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

দীক্ষালাভান্তে গুরু প্রদর্শিত (৩) ভজন ক্রিয়া যজনপূর্ব্বক প্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা করা উচিত। কারণ শ্রীগুরুদেবকে পরিতুষ্ট করতে পারলে ভগবানও সেবকের প্রতি প্রসন্ন হন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হলে মঙ্গল লাভের আর কোন উপায় থাকে না।

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যা প্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।"

গুরুদেবের নিকটে পরিপ্রশ্নমুখে সদ্ধর্ম শিক্ষা করতে করতে গুরুসেবকের (৪) দুস্ত্যাজ্য অনর্থ সমূহ নিবৃত্তি হতে থাকে। তাতেই সাধকগণ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। এইজন্য ভক্তগণের পক্ষে "গুরুসেবা" একটি অপরিহার্য্য প্রধান ভক্ত্যঙ্গ। ইহার দ্বারাই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

শ্রীগুরুকৃপালব্ধ সাধকগণ ক্রমে ক্রমে ভক্তিসাধনে (৫) নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হতে থাকেন; তখন কৃষ্ণকথা শ্রবন কীর্তনাদিতে স্বাভাবিকভাবে (৬) রুচির উদয়

হতে থাকে। এই সময় কোনমতেই ভক্তির অনুশীলন ছাড়িতে পারেন না। অধিকন্তু শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাতে (৭) অত্যন্ত আসক্তির উদয় হয়। (১) শ্রদ্ধা হতে আরম্ভ করে (২) সাধুসঙ্গে (৩) ভজন ক্রিয়া (৪) অনর্থ নিবৃত্তি (৫) নিষ্ঠা (৬) রুচি ও (৭) আসক্তি এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তির গতি, সাধনের এক একটা স্তর অতিক্রম করতে সাধককে বহুজন্ম অতিবাহিত করতে হয়। আবার শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ স্তরসমূহ অতিক্রম করে চিন্ময় আনন্দের অধিকারী হতে পারে। ভক্তি সাধকগণের শ্রদ্ধা ভূমিকায় যে আনন্দ অনুভূত হয়, সাধুসঙ্গ ভূমিকায় উহার বিস্তার লাভ হয়। ভজনের ক্রিয়া ভূমিকায় নব নব আনন্দের অনুভব হতে থাকে। অনর্থের নিবৃত্তি যে পরিমাণে হতে থাকে, সেই পরিমাণে চঞ্চল মন শান্ত হতে থাকে এবং বিমল আনন্দের আস্বাদন পেতে থাকে, তখন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে বিশেষ নিষ্ঠা হতে থাকে এবং মায়িক বস্তুর প্রতিও স্বাভাবিক ভাবে বিতৃষ্ণা জন্মে। নিষ্ঠা হতে যখন রুচির উদয় হয়, তখন ভক্ত্যঙ্গ যাজনে প্রচুর নির্মল আনন্দ আস্বাদন হতে থাকে। ভক্তি সাধনে অধিক রুচি লাভ হলেই আসক্তির উদয় হয়। সেই সময় ভক্তি সাধকগণ কোনমতেই ভগবৎ সেবা হতে বিরত হতে পারেন না এবং সর্বদা বিমল আনন্দের আস্বাদন করতে থাকেন।

(৬) প্রেমিক ভক্তগণের প্রাথমিক অবস্থাকে 'প্রেমাংকুর' বা 'ভাব' বলে এবং পরিপুষ্ট অবস্থাকে 'প্রেম' বলে। জাত প্রেমাংকুর ভক্তের নয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ (ভঃ রঃ সি পূ ৩।২৫-২৬)

(১) ক্ষোভের (উদ্বেগের) কারণ উপস্থিত হলেও জাত প্রেমাংকুর ভক্ত ক্ষোভিত হ'ন না, কৃষ্ণেতর কার্যে (২) বৃথা সময় নষ্ট করেন না, জড়বিষয় ভোগাদিতে স্বাভাবিকভাবে (৩) 'বিরক্তির উদয় হয়, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদানপূর্বক উৎকৃষ্ট হয়েও নিজ বিষয়ে (৪) 'মানশূন্যতা' প্রদর্শন করেন, 'ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন'—এই প্রকার 'আশাবন্ধ' হৃদয়ে ধারণ করেন। নিজাভীষ্ট লাভের জন্য অত্যন্ত লালসারূপ (৫) সমুৎকণ্ঠা প্রবল হয়ে পড়ে, (৬) শ্রীকৃষ্ণ নামগানে সদা রুচি হওয়ায় ইতর কথা আলোচনা আর ভাল লাগে না, (৭) তখন কৃষ্ণগুনগানে অত্যন্ত আসক্তির উদয় হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও (৮) নামগানের অরুচি জাগে না, (৯) শ্রীধাম বৃন্দাবন-শ্রীধাম নবদ্বীপ আদি কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থান করতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ভাবাঙ্কুর জন্মিলে ভক্তের এই সমস্ত লক্ষন স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়ে থাকে।

ঐ সমস্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হলেই প্রেমের উদয় হয়। তখন প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে অত্যন্ত আদ্রতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে অনন্য মমতা ও স্থায়ী ভাবের আবির্ভাব হয়। সর্বাভীষ্টবস্তু লাভ করে, প্রেমানন্দ সাগরে নিরন্তর অবগাহন করতে থাকেন,

"ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসী।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥" (ভঃ রঃ সি পূ ৪।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র ঋষির অন্যতম কবি ঋষি প্রেমিক ভক্তের আনন্দ আস্বাদনের লক্ষণ বর্ণনা করছেন।

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি,
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" ॥ (ভা ১১।২।৩৯)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ (ভা ১১।২।৪০)

প্রেমিক ভক্ত বিষয়াসক্তি বর্জিত হয়ে বিলজ্জভাবে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল জন্মলীলা বিষয়ক নামসমূহ কীর্ত্তন করতে করতে সর্বত্র বিচরণ করেন। তখন তিনি লোকলজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় কখন হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও বা নৃত্য গীত করতে থাকেন।

"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দ সমুদ্রমগ্নাঃ ॥" (ভা ৮।৩।২০)

ঐকান্তিক শরণাগত প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত সমূহ কীর্ত্তন করতে করতে আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে থাকেন অর্থাৎ প্রেমানন্দে বিহ্বল হন। কলিযুগোচিত ধর্ম প্রবর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনকেই প্রেমানন্দ-লাভের একমাত্র উপায় বিঘোষিত করেছেন। এই সংকীর্ত্তনের ফলে (১) জীবের দুরারোগ্য হৃদ্রোগরূপ অনর্থসমূহ অতি সহজেই উপশমিত হয়, (২) আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের জ্বালা নিবৃত্তি লাভ করে, (৩) পরম মঙ্গল বিতরিত হয়। (৪) শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচিলাভই সমস্ত বিদ্যানুশীলনের ফল—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত হয় ॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রভাবেই (৫) প্রেমানন্দ সমুদ্র ক্রমবর্দ্ধন হতে থাকেন (৬) প্রতিক্ষণ প্রেমানন্দামৃত আস্বাদন হতে থাকেন এবং (৭) আত্মা সর্বতোভাবে সুপ্রসন্নতা লাভ করেন।

"চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কলিজীব সমূহকে আহ্বান করে মঙ্গলোপদেশ করেছেন,

"সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৮।৯৩)

যদি সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার বাসনা থাকে, যদি শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্তনামৃত রস-মাধুরীতে রমণ করতে মন হয়, যদি প্রেমানন্দ সাগরে বিহার করতে অভিলাষ থাকে, তাহলে শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগত হও।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শরণাগত হতে ইচ্ছা হলে তাঁহার ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তের সঙ্গ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তের কৃপাতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপরিসীম কৃপা লাভ করা যায়।

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥" (চৈ চ অ ৫।৩২)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ-প্রাপ্ত ভক্ত (১) জ্ঞানী ও যোগীগণের চির অভীষ্ট ব্রহ্মসাযুজ্য ঈশ্বর সাযুজ্যকে নরকতুল্য ঘৃণ্য বলে অনুভব করেন, (২) স্বধর্মনিষ্ঠ পুণ্যবান কর্মিগণের অতিবাঞ্ছিত স্বর্গসুখকে আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক মনে করেন, (৩) উৎপাটিত বিষদন্ত কাল সর্পের ন্যায় বশীভূত দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়সকলকে বিঘ্ননাশক ও সেবানুকূল্যকারী বলে অনুভব করেন, (৪)

কারগার সদৃশ দুঃখময় সংসারকেও পরিপূর্ণ আনন্দ ধাম বলে উপলব্ধি করেন, (৫) ইন্দ্রত্ব-ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি সুদুষ্প্রাপ্য পদবী-সমূহকে নগণ্য কীট যোনির ন্যায় তুচ্ছ বোধ করেন।

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
"দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত "প্রেমানন্দই" আত্মার পরিতুষ্টি সাধক সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর হতেই পারে না।

শুদ্ধভক্তি

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তির" কথাই এ জগতে প্রচার করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সকামভক্তি, কৈবল্যভক্তির কথা মুনি, ঋষিগণ বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে বিপুলভাবে বর্ণনাপূর্বক প্রচার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাণীতে জগতের অধিকাংশ লোক আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন মার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভঃ রঃ সি পূ ১।১১)

যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বিরোধী কোন প্রকার অভিলাষ থাকে না, যাহা

ভোগ মোক্ষাকাঙ্খা দ্বারা প্রতিহত হয় না এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির অনুকূল চেষ্টাযুক্ত, তাহাকেই উত্তমাভক্তি বা শুদ্ধভক্তি বলে।

ভগবৎ সেবাবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবগণ অনিত্য জড়ীয় সুখের জন্য নানাপ্রকার অভিলাষ চালিত হইয়া নীতিবিগর্হিত অকর্ম্ম বিকর্মে রত হয়। বিপুল চেষ্টা করিয়াও যখন উহারা নিববচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে পারে না, অধিকন্তু রোগ, শোক, জরা, ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এবং স্বসুখ কামনা পূরণের জন্য বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানকে কামনামুখে আরাধনা করিতে থাকে। উহাদের আরাধনা ভগবানের সুখোৎপাদনের জন্য নহে। ভগবানের দ্বারা নিজেদের কামনা পূরণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

জ্ঞানিগণ মুক্তিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা—নিরাকার ব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রথমে সাকার ভগবানের পূজা ও শ্রবণ কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। সাকারের ধ্যান করিতে করিতে নিরাকার ব্রহ্মে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। "সাধকানাং হিতার্থাং ব্রহ্মণেরূপ কল্পনম্" তাহাদের এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল কারণ উহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ॥

জ্ঞানি জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।

(—চৈ চ ম ২২।২৯)

শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে তুচ্ছ ভুক্তিমুক্তি দিয়া বঞ্চনা করেন, শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

(চৈ চ আ ৮।১৮)

ভুক্তি কামিগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এবং মুক্তিকামিগণ মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে

পারিলেও পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে না। যে ভক্তি দ্বারা ঐ প্রেম লাভ করা যায় এবং অজেয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জয় করা যায়, বশীভূত করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তি। এই ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ ভেদে দুইটি বৃত্তি আছে। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান-যাজন করাই শুদ্ধ ভক্তির "স্বরূপলক্ষণ"। শুদ্ধভক্তগণ প্রীতির সহিত চক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করেন। কর্ণ দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ করেন, নাসিকা দ্বারা প্রসাদী-তুলসী মাল্য পুষ্পাদির ঘ্রাণ গ্রহণ করেন; জিহ্বাদ্বারা ভগবৎ প্রসাদ সেবন করেন ও ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করেন; হস্তদ্বারা শ্রীবিগ্রহের পরিচর্যা করেন, পা দ্বারা ভগবৎধাম ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন—এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে ভগবৎ সুখকর সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া সেবানন্দে বিভোর থাকেন। "কামরিপুকে" কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে নিযুক্ত করিয়া কামজয়ী হন, ক্রোধকে ভক্ত-ভগবানের বিদ্বেষীগণের প্রতি প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাদের মঙ্গল বিধান করেন।

এইরূপে শুদ্ধভক্তগণ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া উহাদের গতি পরিবর্ত্তন করেন, এককথায় শুদ্ধভক্তগন যে সমস্ত ভগবৎ সুখকর অনুষ্ঠান যাজন করেন, উহাকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

কৃষ্ণসেবা বিরোধী আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলা স্ত্রীসঙ্গাদি দুর্নীতিপূর্ণ বিকর্ম ও স্বসুখ কামনা মূলে স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ পরিবর্জনে শুদ্ধ ভক্তগণ দৃঢ়নিষ্ঠ হন। ভক্তিবিরোধী অষ্টাদশ বিভূতি, নির্ব্বাণ মুক্তি আদিও তাঁহারা আকাঙ্খা করেন না। এমনকি স্বয়ং ভগবান্ উহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি-আদি প্রদান করিতে চাহিলেও উহারা গ্রহণ করেন না; একমাত্র ভগবৎ সুখকর সেবা ছাড়া আর কিছু আকাঙ্খা করেন না।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

ভগবান্ কপিলদেবকে বলিতেছেন—

আমার বসতিস্থল বৈকুণ্ঠ বাস, আমার ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ, আমার ন্যায় চতুর্ভুজ প্রাপ্তি, আমার নিকটে বাস এবং আমাতে লীন—এই পঞ্চবিধ মুক্তি। এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি শুদ্ধভক্তগণকে প্রদান করিলেও আমার সেবা ছাড়া তাহারা উহা গ্রহণ করে না। এই সমস্ত প্রতিকূল বর্জনে দৃঢ় নিষ্ঠাই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। ভক্তি সাধকদের যখন এই তটস্থ লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখনই তাঁর "প্রেমধন" লাভ হয়।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া-তার 'স্বরূপ' লক্ষণ।
'তটস্থ' লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥

—(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৬)

ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যাজন করিয়াও যখন পুরুষার্থসার প্রেমের উদয় হয় না, তখন বুঝিতে হইবে ভক্তির প্রতিকূল-ভুক্তি-মুক্তিরূপ কুজ্ঝটিকা হৃদয়াকাশকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে—তাই প্রেমসূর্য্য হৃদয়াকাশে উদয় হইতে পারিতেছে না।

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

—(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

শ্রীধ্রুব মহারাজ রাজ্যলাভের আশায় পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীহরিকৃপাতেই রাজ্যলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকার কামনামূলে ভগবৎ আরাধনাকে ' সকামা" ভক্তি বলা হয়। ঐ প্রকার মুক্তি লাভের জন্য যে ভগবৎ আরাধনা তাহাকে "কৈবল্যকামা" ভক্তি বলে। এই সমস্ত কামনামূলা ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয় না। এই ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীদ্বয় ভক্তিযাজী সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে উহার মতিচ্ছন্ন হয়, কোন মতেই সাধনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২২)

এজন্য প্রেমাকাঙ্ক্ষী ভক্তকে অতিযত্নের সহিত ভুক্তি মুক্তি পিশাচীদ্বয়কে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করা কর্তব্য ও ভক্তিবর্হিমু্র্খের সঙ্গ বর্জনের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। এমনকি উহারা যে স্থানে অবস্থান করে, উহার ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করিতে নাই। ভক্তি বিরোধী গ্রন্থপাঠ করিতে নাই। অন্য বহিমু্র্খ লোকের কথা আর কি বলিব—নিজের পিতামাতা-স্ত্রীপুত্র-পরিজনগণ যদি ভক্তিপ্রতিকূল আচরণ করে, তবে তাহাদিগের সঙ্গও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রদ্ধালু গৃহীগণের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও ভাল তথাপি ঐ প্রকার ভক্তি বিরোধীগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিতে নাই। এককথায় শুদ্ধভক্তি যাজিগণকে ভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজ নিজ চেষ্টায় যদি ঐসব প্রতিকূল বর্জ্জন করিতে সমর্থ না হয় তবে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট নিষ্কপটে প্রতিকূল বর্জ্জনের শক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে, তখন পতিতের বান্ধব, দয়াল শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ ঐ ভক্তিযাজিগণের পক্ষ গ্রহণ পূর্বক সর্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিশ্চয়ই আবেদন জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহাদের আবেদনে ভগবানও ভক্তিযাজিগণকে প্রতিকূল বর্জনে শক্তিপ্রদান পূর্বক প্রেমধন দিয়া নিজ চরণের নিত্যসেবক করিয়া রাখিবেন।

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম॥

দুস্ত্যজ আর্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎর্সন ॥
সর্বত্যাগ করি, করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৭-১৬৯)

প্রেমিক ভক্তের এবংবিধ সেবার ফলে ভগবান অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ হয়ে নিত্যকাল তাঁহার বশীভূত হয়ে থাকেন, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী গোপীগণকে নিজমুখে বলিতেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥
(ভাঃ ১০।৩২।২২)

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্মল, বহু জন্মেও আমি নিজ সংকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না। যেহেতু তোমরা অতিকঠিন সংসার শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, অতএব তোমরা নিজ কার্য্যের দ্বারা পরিতুষ্ট হও।

শুদ্ধভক্তগণ দেহ পোষণের জন্য ভোজন আচ্ছাদনের যে চেষ্টা করেন, উহা তাহাদের নিজ সুখের জন্য করেন না। "এই দেহ কৃষ্ণসেবার উপকরণ ইহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন ; সেই জন্য ইহাকে খাদ্যাদি দিয়া পুষ্ট করিতে হইবে। বস্ত্রাভরণ দ্বারা সাজাইতে হইবে, বিশ্রাম দিয়া সুস্থ রাখিতে হইবে— এই বিচারে ভক্তগণ নিজদেহ পোষণ করেন ; ইহাতে কিছু মাত্রও আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির কোন কথা নাই, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের অখিলচেষ্টা, কৃষ্ণকে সুখী করেই নিজেরা সুখ অনুভব করেন।

কৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করে যতটুকু সুখী হন ; ভক্তগণ তাঁহাদের সেবা করে, তাহা হইতে কোটিগুন সুখী হন। ভক্তগণের স্বসুখ কামনা না থাকিলেও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করে কৃষ্ণ সুখী হয়েছেন ইহা দর্শন করে ভক্তগণ সেবাসুখ অনুভব করেন। আবার কৃষ্ণও ভক্তগণকে সেবাসুখে মগ্ন দর্শন করে অত্যন্ত সুখী হন। ভক্তবৎসল ভগবানের প্রসন্ন বদন দর্শন করে ভক্তগণও আরো অধিক সুখী হন। এই প্রকারে ভক্ত ভগবানের প্রেমের হুড়াহুড়ি হইতে থাকে।

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধিপ্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৯৯-২০৯)

সেবানন্দ অনুভব বশতঃ যদি সেব্যের সেবায় বাধা উপস্থিত হয়, তবে সেই আনন্দকেও ভক্তগণ আদর করেন না বরং ঐ আনন্দের প্রতি মহাক্রোধ প্রকাশ করেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সেবক দারুক চামর ব্যজন করায় শ্রীকৃষ্ণ সুখে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ইহা দর্শন করিয়া দারুক সেবানন্দে মগ্ন হওয়ায় জড়তা বশতঃ হস্ত হইতে চামর ভূপতিত হইল, ইহাতে চামর ব্যজন সেবায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় দারুক ঐ সেবানন্দকেও অত্যন্ত ধিক্কার করিতে লাগিলেন। আর এক দিবস পদ্মলোচনা শ্রীরাধারাণী অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করায় তাঁহার নেত্রে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অশ্রুবর্জনের ফলে তিনি কৃষ্ণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল সুন্দর বদন কমল দর্শন করিতে না পারায় ঐ আনন্দাশ্রুকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই জন্য প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে নিজ সুখের কোন প্রকার গন্ধও থাকিতে পারে না।

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি, 'জ্ঞান কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হইতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯। ১৬৭-১৬৮)

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
(শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥
(ভাঃ ৩। ২৯। ১১)

কর্ম্মজ্ঞান মল নির্ম্মুক্ত ও জড়াভিমানরূপ আবরণ শূন্য হইয়া সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুকূলে সেবার নামই শুদ্ধভক্তি। গঙ্গাকে যেরূপ সমুদ্র মিলনে বাধা প্রদান করিয়াও রাখা যায় না, শুদ্ধভক্তির উদয়ে ভক্তকেও সেইরূপ ভগবৎসেবা হইতে প্রতিরুদ্ধ করা যায় না। কেননা শুদ্ধভক্তি অবান্তর ফলানুসন্ধান রহিত এবং দেহ দ্রবিণ আদি ব্যবধান বর্জিত। যে পর্যন্ত সাধকের হৃদয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তি কামনা বর্ত্তমান থাকে সে পর্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের আভাসও উদিত হয় না। শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয় এবং শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই শুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হয়।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"

* * *

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩। ২৫। ২৫)

সাধক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা

সাধকজীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিলে কখনও সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উন্নতিলাভের মূলে গুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণ আনুগত্য। আনুগত্য বা শরণাগতি বাদ দিয়া কেহ কখনও সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 'আনুগত্য' বলিতে গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন ; তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়া তাহাদের প্রীতিবিধানের জন্য সমস্ত সেবাকার্য্যাদি করা বুঝায়। যাঁহাদের প্রীতিবিধান করিতে পারিলে সকল আশাপূর্ণ হইয়া যায়, সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত সেবাকার্য্যাদি না করিয়া খেয়ালমত সেবার অভিনয় করিয়া জীবিত থাকিয়াও কোন লাভ নাই, বরং ঐরূপ সেবার অভিনয় করিতে করিতেই চিরকালের জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা হয়।

আরাধ্যভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয় সিংহাসনে উপবেশন করাইবার জন্য সাধককে স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রের তৃণ গুল্ম ধূলি কঙ্করাদি রূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সমস্ত অন্যাভিলাষাদি থাকাকালে ভক্তিমহাদেবী হৃদয়ে কখনও উদিত হন না।

ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিঃ ২।১৫)

হৃদয়কে একটী ক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা হইতেছে। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তৃন কঙ্করাদি সমস্ত বিদূরিত করিয়া পরে উত্তমবীজ রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রটি যদি উত্তম না হয়, তবে উত্তম বীজ রোপিত হইলেও উহা ফলবান বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিবে না। সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে যদি অন্যাভিলাষাদি

থাকে তবে ভক্তিলতার বীজ রোপিত হইলেও তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে সাধকের খুব যত্ন স্বীকার করিতে হয়। ইহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ যত্ন না করিলে কখনও উন্নতিলাভ করা যায় না।

নিজের দোষ নিজেকে দেখা যায় না। অন্যে যদি দেখাইয়াদেন—ভুল ধরাইয়া দেন, তবে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহাকে প্রকৃতবন্ধু জানিয়া যেহেতু তিনি প্রকৃত সত্যকথা বলিয়া ভুলপথ হইতে আমাকে মঙ্গললাভের পথে লইয়া যাইতেছেন ; নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। সাধনাবস্থায় মঙ্গললাভের একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে—"অন্যাভিলাষ"। এই অন্যাভিলাষ শব্দে অর্থ হইতেছে—জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব। এইরূপ ইতর অভিলাষ নিজের সুখের জন্য সবকিছু করিব—"দেহের সুখ সুবিধাটি বজায় রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবা যতটুকু করা যায়—এই বিচারটা দৃঢ় থাকিলে কোনকালেও হরিভজন হইবেনা। শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানচেষ্টা যাঁহার যত প্রবল হইবে তিনি তত নিজের সুখের চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়া ইতর বা অন্য অভিলাষ পোষণ করিলে অর্থাৎ নিজের সুখের অভিলাষ করিলে কোন মঙ্গললাভত হয় না বরং অমঙ্গল শীঘ্রই করতলগত হয়। উহা (অন্যাভিলাষ) কণ্টকপূর্ণ তৃণের ন্যায় শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্‌বৃত্তি কেবলাভক্তিকে বিদ্ধ করে। এই জন্য এই অন্যাভিলাষ রূপ তৃণকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অতিযত্নের সহিত সত্বর উঠাইয়া দিতে হইবে।

সাধনের আর একটা অন্তরায় হইতেছে কর্মস্পৃহা। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সৎ ও অসৎকর্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে মলিন করিয়াছে—তাই তাহার কর্মবাসনা দূর হইতেছে না। কৃষ্ণসেবা কার্ষ্ণসেবা ভিন্ন যে সমস্ত কার্য করে উহা বাহিরে সেবাকার্যের মত দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সেবা নয় উহা কর্ম। আবার তাঁহাদের আনুগত্যে যে সমস্ত কার্য কৃত হয়

উহাকেই ভক্তি বলে। কর্মের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয় অর্থাৎ কর্মাদির স্পৃহা হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

সাধকের আর একটি শত্রু হইতেছে—জ্ঞানচেষ্টা। নির্ব্বিশেষে ও কৈবল্য-যোগ বা জ্ঞানযোগাদি চেষ্টা ঠিক কঙ্করের মত। কঙ্করপূর্ণ জমিতে কখনও বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সেইরূপ নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবাত দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেলবিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করাহয়। সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ ভাগ্যহীন বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। এই জন্য এই জ্ঞানরূপ কঙ্করকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অতিসত্বর বিদূরিত করা উচিৎ।

সাধন করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনরূপজলসেচনের দ্বারা ভক্তি-লতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই লতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোম স্থানপ্রাপ্ত হয়। তথা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া গোলোক বৃন্দাবন পর্যন্ত গমনকরত কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। তখন ঐ লতাতে প্রেমফল ফলে। অতিযত্নের সহিত সাধন করিলে অতিসত্বর প্রেমফল লাভ করা যায়। কিন্তু সাধন করিতে করিতে যখন অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম জ্ঞানের স্পৃহাটা একটু শ্লথ হইয়া আসে, হরিভজনে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তখন নিজেকে একটু বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান হয়। নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান হইলে আর অন্য বৈষ্ণবকে তখন উপযুক্ত সম্মান দিতে ইচ্ছা হয় না। বৈষ্ণবের আদেশ পালন করিতেও উৎসাহ হয়ই না, বরং উহা লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠাবোধ হয় না। তিনি আমাকে আদেশ করিতে কে? আমার কি কোন অধিকার নাই? প্রভৃতি নানাপ্রকার বিচার তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এই রূপ করিতে করিতে সে গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। তাঁহাদের চরণে অপরাধ

হইলে হরিভজন হইতে চিরতরে ছুটী হইয়া যায়। সুতরাং সাধনকালে এমনকি সর্ব্বসময়ে যাহাতে তাঁহাদের চরণে অপরাধ না হয় তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিজে বৈষ্ণব অভিমানী না হইয়া সর্বক্ষণ তাঁহাদের দাসানুদাস থাকিয়া কৃপাপ্রার্থনামুখে সেবা করিতে থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী আর ভক্তি-লতাকে ছিন্ন করিবে না।

অনেক সময় কর্মজ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। ঐ মলগুলি আর কিছু নয়, উহা হইতেছে—কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার লাভ পূজা প্রভৃতি। সাধন করিতে করিতে আমি গুরুবৈষ্ণবগণের দাসানুদাস—এই বিচারের পরিবর্ত্তে যখন নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান হয় তখনই এইসমস্ত উৎপাত সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন নিয়মিতভাবে হইতে থাকিলেও কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাদি উৎপাত প্রবল হওয়ার জন্য ভক্তি লতার মূল শাখা বাড়িতে পারেনা। এই ভাবে বহু বৎসর সাধন করিলেও উন্নতি হয় না, বরং বৈষ্ণবাপরাধাদি দোষে পতনই হইয়া থাকে।

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবুত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন"॥

কুটিনাটি শব্দে কৌটিল্যানর্থনাট্য বা কপটতাকে বুঝায়। হৃদয়ে একভাব বাহিরে আর এক ভাব অর্থাৎ যাহারা কপট তাহারা অসরল, অন্তরে ও বাহিরের ভাব তাহাদের একনয়; মুখে এক কাজে আর। এরূপ ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হইতে পারেনা। বৈষ্ণবের নিকট আঁকু পাঁকুভাব শরণাগতের ন্যায়ভাব প্রদর্শন, কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে বৈষ্ণবের দোষালোচনা, তাঁহার আদেশ পালন করিতে অনিচ্ছা। কপটি গুরুবৈষ্ণবকে বিশ্বাস করে না। বিষয়ী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতির কখনও মঙ্গল হইতে পারে কিন্তু কপটীর কখনও মঙ্গল হয় না। এই কপটতা পরিত্যাগ ব্যতীত কখনও মঙ্গল হয় না। এই কপট পরিত্যাগ করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-গাইয়াছেন ঃ—

*   *   *   *

আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
কপটতা নাম তার, তারে কুটিনাটি ভার
খরমূর্ত্তি পরম কিতব॥

*   *   *   *

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যার সূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্যবশ যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি।

*   *   *   *

কপটতা হইলে দূর প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে আনিবারে প্রেম রত্নে
কাপট্য রাখহ অতিদূর।

প্রতিষ্ঠাশা আর একটী উৎপাত। উহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি বৈষ্ণব হইতে কোন অংশে কম নই, বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন করেন আমিও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারি; বৈষ্ণব ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আমিও বেশ ভাল পাঠ ব্যাখ্যা করিতে পারি, বৈষ্ণব বক্তৃতাদি দ্বারা বহু ব্যক্তির মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, আমিও বড় বড় সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া সভা মাৎ করিতে পারি। এরূপ বিচার যখন সাধকে হয়, তখন সকলে তাহাকে একজন বড় সাধু বৈষ্ণব বলিয়া জানুক এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদি প্রাপ্তির জন্য সে নানা প্রকার বুজরুগী প্রদর্শন করে বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা করে, বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিতে চায়, প্রতিষ্ঠার মোহে অন্ধ হইয়া পরমারাধ্য গুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ধৃষ্টাধমা প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী যতদিন

হৃদয় হইতে বিদূরিত না হইবে, ততদিন প্রতিষ্ঠাশা—উপপতি কাপট্যও হৃদয় হইতে দূর হইবে না। প্রভুপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া কৃপাপ্রার্থনামুখে সেবা করিলে এবং প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ করিবার প্রবলচেষ্টা হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় উহা দূরীভূত হইবে, নতুবা উহা বিদূরিত হইবে না।

জীবহিংসা বলিতে আমরা সাধারণত মনে করি, অন্য প্রাণীদের উদ্বেগ দেওয়া বা তাহাদের দেহপাত করা। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবহিংসা বলিতে জীবাত্মার প্রতি হিংসাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানহিংসা বলিয়াছেন। জীবহিংসা শব্দে শুদ্ধভক্তি প্রচারের কুণ্ঠতা বা কৃপণতা এবং মায়াবাদী, কর্মী, অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া ও তাহাদের মন রাখিয়া কথা বলাকে বুঝায়। সাধন করিতে করিতে সাধক যদি মনে করে, আত্মধর্মের কথাপ্রচার করিতে গেলে যাহারা অনাত্মধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট আছে, তাহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার বিবাদ হইতে পারে, সুতরাং কাহারও সহিত কলহ না করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া যার যার ধর্ম তার তার কাছে এই বিচার লইয়া আমি হরি ভজন করিয়া যাই"—তাহা হইলে তাহার উন্নতি ত হইবেই না, বরং সে শ্রৌতপথ হইতে বিচ্যুত হইবে।

সাধকের আর একটি উৎপাত আছে, উহা হইতেছে নিষিদ্ধাচার। নিষিদ্ধাচার শব্দে স্ত্রীসঙ্গী এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়। সাধক মনে করে—"আমি যখন বৈষ্ণব হইয়াছি তখন আমি যাহা কিছু করিনা কেন, তাহাতে দোষ হইবে না। এই বিচার লইয়া সে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। কিন্তু এই নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ না করিলে সাধনে উন্নতি হয় না। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্তআর॥

লাভও একটি ভজনের উৎপাত। এই "লাভ" শব্দের অর্থ ধর্ম্মের নামে

অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। সাধকের কোনও সময় বহির্মুখলোকের নিকট হইতে নিজের সুখের জন্য কোন কিছু চাওয়া কখনই উচিত নহে।

জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলার দ্বারা একটী চমৎকার শিক্ষা দিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে হইলে হৃদয়ের যাবতীয় মলধৌত করিয়া হৃদয়কে নির্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জল করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যখন দুই বার করিয়া গুণ্ডিচামার্জন করিয়া তৃণ, ধূলি, কঙ্করাদি দূর করত উত্তম জলে ধৌত করিয়া আপনার পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা সূক্ষ্ম দাগগুলিও ঘর্ষণ পূর্বক ভগবদ্ পীঠ স্থান মার্জন করিলেন—সেই রূপ সাধককে হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি উত্তমরূপে দূরীভূত করিয়া হৃদয়কে বৃন্দাবন রূপে নির্মল করিয়া স্বরাট কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য ভগবানের সুখের জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্বহৃদয়ের মার্জ্জন করিতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াও বহু ভাগ্যফলে জগদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া তদীয় উপদেশবাণী নিজজীবনে পালন করিয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করার সুযোগ পাইয়াও দুর্দ্দৈববশতঃ উহা নিজে পালন না করিয়া দুদিনের সাজাবৈষ্ণব হইয়া অপরকে উপদেশ করিতে অপরের প্রতি প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সাধুর কাছে যাইতে ইচ্ছা হয়না, সাধুর কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয়না, সাধুর উপদেশ শুনিতে ভাললাগেনা। বৈষ্ণবগণ যখন ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, তখন উহার নিকটও যাইতে ইচ্ছা হয় না—শুনতে একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যদি কখনও বৈষ্ণবগণ পাঠ করিতে বলেন, তখন মনে হয়, আমার ব্যাখ্যা সকলের শ্রবণ করা দরকার অর্থাৎ এককথায় বলিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে মাদৃশ সাজাবৈষ্ণবের কীর্ত্তন করিতে ভাল লাগে

কিন্তু শ্রবণ করিতে ভাললাগে না, আচরণ করিতে ভাল লাগে না। তাই ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

গর্হিত আচারে রহিলাম মজি
না করিনু সাধুসঙ্গ।
লয়ে সাধুবেশ আনে উপদেশি
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥

অসংখ্য দোষে দোষী হইলেও সাধক মঙ্গললাভ করিতে পারে যদি গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষু হয়। পূর্বে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক অগতির গতি শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়তার সহিত আশ্রয় করিলে পরম দয়ালু পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব তাহাকে কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে সর্বক্ষণ দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়া সাধন করিলে তাঁর কৃপায় জীবের কখনও পতন হয় না; বরং নিত্য মঙ্গল অতি সত্বর লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা

ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সৎ চিৎ আনন্দময় বিগ্রহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর তিনি সকলের আদি, তাহার আদি কেহ নাই; সুতরাং তিনি অনাদি। তিনিই সর্বকারণের মূল কারণ। 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে 'শ্রী'+'কৃষ্ণ' বুঝায় 'শ্রী' শব্দে 'লক্ষ্মী' 'লক্ষ্মী' কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব। শক্তি শক্তিমানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শক্তিমানও

'শক্তি' বিরহিত হইতে পারেন না। এই জন্য 'কৃষ্ণ' তদীয় স্বরূপশক্তিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারেন না ; তিনি সর্বক্ষণ 'শ্রী'যুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রী' বা 'লক্ষ্মী' বলিতে সর্বলক্ষ্মীগণের আশ্রয় স্বরূপা শ্রীরাধিকাকেই বুঝায়। এইজন্য শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের সর্বকান্তাগণের শিরোমণি। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সর্বপ্রকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থা অন্য কেহই সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ জগতের সর্বজীবগণকে মোহন করেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণশক্তিমান্। মৃগমদ ও তার গন্ধ যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, সেইরূপ 'শ্রীরাধা' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' অভিন্ন একই রূপে; শুধু লীলারস আস্বাদন করার জন্য পৃথক রূপ ধারণ করেন।

অনন্ত জীবনিচয় জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণেরই সন্তান। পিতার স্নেহ বা কৃপা সকল সন্তানের প্রতিই বর্ষিত হয়ে থাকে। তবে অনুগত সন্তানের প্রতি স্নেহের পরিমাণটি অধিক দেখা যায়। অবাধ্য দুষ্ট কুসন্তানের জন্য পিতা তাকে দণ্ডই প্রদান করেন। জগৎ পিতা ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবকে স্নেহ করিলেও তাঁহার অনুগত ভক্তের প্রতি অধিক বাৎসল্য প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে ভগবৎ বিরোধীগণের বিনাশপূর্বক মঙ্গল সাধন করেন। সূর্যদেব সকলকে সমভাবে কিরণ বিতরণ করিলেও আবরণযুক্ত স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিগণ যেরূপ সূর্য্যকিরণ পায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই সমভাবে কৃপা করিলেও বিমুখ অভক্তজনগণ ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ 'পরমাত্মা' প্রত্যেক জীব হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সাক্ষীরূপে জীবের 'সৎ' 'অসৎ' কার্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, আর জীব ঐ সমস্ত কার্য্যের ফল ভোগ করিতেছে। অপরদিকে স্বয়ং ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ' ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছেন।

'বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম'। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ সুখে বিশ্রাম করেন কেন? কারণ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় এবং শ্রীকৃষ্ণও ভক্তগণের হৃদয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ছাড়া জানেন না, ভক্তও কৃষ্ণ ছাড়া জানেন না। ভক্তগণ নিষ্কাম এবং পরম শান্ত। তাঁহারা নানা প্রকার কামনা বাসনা পূরণের জন্য কৃষ্ণের নিকট তুচ্ছ বস্তু সকল প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করেন না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ভক্তের শান্তহৃদয়ে পরমানন্দে নিরন্তর বাস করেন। সেই জন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতরাশি ভক্তের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। অভক্ত অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার রামনৃসিংহাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। তাঁহার সহিত বদ্ধ জীবের সাক্ষাৎকার হয় না। এই জন্য অনাদি বহির্মুখী জীবকে অহৈতুকীভাবে কৃপা করার জন্য তিনি মহান্তগুরু রূপে এই জগতে প্রকটিত হন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

মায়াবদ্ধ জীব যখন ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত হইয়া সংসার দাবানল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ মহান্তরূপে এবং চৈত্ত্যগুরুরূপে তাহাকে উদ্ধার করেন।

কৃপালাভের উপায়

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।

পূর্বপূর্বজন্মের পুঞ্জিকৃত সুকৃতি ফলে জীব যখন ভগবানের দিকে উন্মুখ হইতে ইচ্ছা করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তদভিন্ন আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে ঐ জীবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহা মায়াবদ্ধজীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা। এই

প্রকারে সুকৃতিবান্ জীব কৃষ্ণের অযাচিত কৃপায় যখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেন তখন তিনি তাঁহার কৃপাশাসন গর্ভে অবস্থান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সমূহ যাজন করিতে থাকেন। শ্রীগুরুদেবের সেবা এবং কৃষ্ণভজন প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই শ্রীগুরুর কৃপা লাভ হয়, আবার শ্রীগুরু কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কৃপালাভ হইয়া থাকে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা করার জন্য গুরু রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণকৃপা বাস্তব বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন 'শ্রীগুরুরূপে'। কৃষ্ণে অনুগত শরণার্থী ভক্তগণের প্রতি গুরুরূপে কৃপা করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অনুগত ভক্তজনের প্রতিই সম্যক্‌রূপে কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেবের একান্ত অনুগত না হইলে শ্রীগুরুদেব স্বীয় হৃদয়ের গূঢ় কৃষ্ণপ্রেমধন শিষ্যকে প্রদান করেন না। শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্টের সর্বতোভাবে আনুকূল্য বিধান করিতে পারিলে, তাঁহার প্রাণসর্বস্ব প্রেম মহাধন শিষ্যকে প্রদান করেন। কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে বিশ্রম্ভের সহিত সেবা করাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপালাভের একমাত্র উপায়।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী দাতাশিরোমণি সর্বাবতারী অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ গৌর কান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্যের অবতার। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।" শাস্ত্রাদিতে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান প্রভৃতি পূণ্যজনক কার্য্যকে পরোপকার বলিয়া বর্ণিত আছে। এই সমস্ত কার্য্যে জীবের যে উপকার সাধিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা কেবল সীমাবদ্ধ কালের জন্য; উহাতে অভাবের চির অবসান হয় না, বা নিত্য শান্তি লভ্য হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর জীবের প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অসমোর্দ্ধ ও অতুলনীয়। এবংবিধ কারুণ্য অন্যান্য ভগবত অবতারেও প্রদর্শন করেন নাই। রাম, নৃসিংহ, বরাহ ও বামন আদি অবতারে ভগবান্ অসুরদিগকে প্রাণে বিনাশ করিয়া ধরণীর পাপভার মাত্র লাঘব করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মহাপাপী, মহাপরাধী, পতিত, পাষণ্ডী নরপশুদিগকে এমনকি বন্য হিংস্র প্রাণীগণকেও প্রাণে বিনাশ না করিয়া তাহাদের অবিশুদ্ধ চিত্তকে সংশোধন পূর্ব্বক পুরুষার্থসার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করিয়াছেন। ভগবান্ অন্যান্য অবতারে যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস কোন যুগে কাহাকেও প্রদান করেন নাই, সেই স্ব-ভক্তি (প্রেমভক্তি) সম্পত্তি আপামর সর্বসাধারণকে বিতরণ করিবার জন্য এই কলিকালে তিনি শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥"

শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাদিগকে অকৃত্রিমভাবে কৃপা করেন, এবং যাঁহারা তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন তাঁহাদের চিত্ত জাগতিক বৈভবাদি লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয় না ; রাজ্য, ঐশ্বর্য, উচ্চপদ ও সম্মানাদি দৈবযোগে প্রাপ্ত হইলেও তাহা মলবৎ পরিত্যাগ করেন, কিংবা নিজে অনাসক্তভাবে ঐ সমস্ত বৈভবাদি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ভগবৎ সেবানন্দে বিভোর থাকায় জড়ীয় সুখ ভোগে আসক্ত হন না। জীব একবার ভগবৎ সেবানন্দের সন্ধান পাইলে আর জড়ানন্দের দিকে ধাবিত হয় না। যতদিন সে সেবানন্দ পায় না, ততদিনই সে তুচ্ছ বিষয়ভোগে মত্ত থাকে। পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর জীবকে নিত্য সেবানন্দে প্রমত্ত করিয়া অনিত্য জড়সুখের কথা ভুলাইয়াছেন।

"তাহান ক�ৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥"
"যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥"
"রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে ॥"

এইজন্য শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব মুখে তাঁহার করুণার বৈশিষ্ট্য এবং তাহার কৃপালব্ধ ভক্তের মাহাত্ম্য বলিতেছেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে।
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ॥
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে।
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত ভক্তগণ, জ্ঞানীযোগীগণের বহুকালের কৃচ্ছ্র-সাধনলব্ধ 'মুক্তিকে' নরকতুল্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন, ধর্মার্থকামিগণের

আকাঙ্খিত স্বর্গকে আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা-অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন, তুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে উৎপাটিতদন্ত কালসর্পের ন্যায় নিস্তেজ বলিয়া অনুভব করেন, রোগ-শোক অভাবগ্রস্ত নিরানন্দপূর্ণ বিশ্বকে ভগবৎ লীলাভূমি স্মৃতিতে আনন্দপূর্ণ দর্শন করেন, ভগবৎ সেবাবৈমুখ্য 'ব্রহ্মত্ব' 'ইন্দ্রত্ব' প্রভৃতি লোভনীয় উচ্চপদবী সমূহকে কীট পদবীর ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি করেন।

তৃণাদপি সুনীচের মহান্ আদর্শ শ্রীগৌরসুন্দর সরস্বতীর বরপুত্র কাশ্মীরদেশীয় দিগ্বিজয়ী কেশব পণ্ডিতের মহাদাম্ভিকতা বিদূরিত করিয়া তাহাকে বৈষ্ণবোচিত গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন, মহাপাতকী মদ্যপায়ী জগাই মাধাই দস্যুদ্বয়কে অহৈতুকী কৃপা করিয়া মহাভাগবতে পরিণত করিয়াছিলেন,—নির্বিশেষবাদী মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের কুতর্কপূর্ণ কর্কশহৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়াছিলেন,—সর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে অযাচিতভাবে নষ্টকুষ্ঠ, রূপপুষ্ট ও ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, মাৎসর্যপরায়ণ নিন্দুক অমোঘ বিপ্রকে মারাত্মক বিসূচিকা রোগমুক্ত করিয়া নির্মৎসর বৈষ্ণব হৃদয়ে পরিণত করিয়াছিলেন,—অপরাধ কাঠিন্য হৃদয় কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন,—ইহা ছাড়া ঝাড়িখণ্ডের মনুষ্যেতর বন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী সর্প প্রভৃতির হিংসা প্রবৃত্তি বিদূরিত করিয়া তাহাদের আত্মধর্মকে জাগ্রত করিয়াছিলেন, এমনকি তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষাদিকেও প্রেমে মত্ত করাইয়াছিলেন।

"ঝারিখণ্ডের' স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥

মহাবদান্যের অবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের 'কৃপা' আপামর সর্ব-সাধারণের উপর বর্ষিত হইলেও বৈষ্ণবাপরাধী 'চাপালগোপাল,' 'শ্রীবাসপণ্ডিতের শাশুড়ী," দেবানন্দ পণ্ডিত,' প্রভৃতির উপর বর্ষিত হয় নাই। কারণ তাহাদের

কৃপালাভের প্রধান অন্তরায় 'বৈষ্ণবাপরাধ'। যে ভক্তের সঙ্গফলে ভক্তিলভ্য হয়; সেই ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে ভক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়।

"যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায়, পাতা॥"

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি করা, 'বৈষ্ণবের আসনে উপবেশন করা,' 'নিজেকে বৈষ্ণবের সমকক্ষ বোধ করা', 'বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা করা', বৈষ্ণবের সাধারণ বেশ ভূষা, আচরণ আদি দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করা', 'বৈষ্ণবকে অজ্ঞ-মূর্খ বোধে অবহেলা করা', 'বৈষ্ণবকে উদ্বেগ প্রদান বা নির্যাতন করা', 'বৈষ্ণবকে উপহাস বা ঠাট্টা করা', 'বৈষ্ণবকে ভৎর্সনা করা বা অভিশাপ প্রদান করা', 'বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করা', 'বৈষ্ণবকে হনন করা', প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বৈষ্ণব অপরাধ সংঘটিত হয়।

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

(১) যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে হনন করে, (২) নিন্দা করে, (৩) দ্বেষ করে, (৪) বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করে, (৫) বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, (৬) বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হয়—এই ছয় কারণে সেই ব্যক্তি অধঃপতিত হয়।

যেরূপ বিজ্ঞ ডাক্তার উত্তম ঔষধ প্রদান করিলেও যদি রোগী ঔষধ যথানিয়মে সেবন না করে, তাহা হইলে রোগ নিরাময় হইতে পারে না, সেরূপ মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর অযাচিত করুণা বিতরণ করিলেও আমরা যদি উহা গ্রহণ করবার জন্য চেষ্টা না করি, তবে আমরা পরমানন্দ লাভ করিতে পারিব না। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা, অন্যাভিলাষ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করা যায় না।

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ একমাত্র কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইতেই ভক্তি লভ্য হয়। "কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।" মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। ইহা ছাড়া প্রেমলাভের জন্য অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবেই তাহার মহাবদান্যের পরিচয়। তিনি জগৎবাসীকে অযাচিতভাবে কৃপা করিবার জন্য, সুদুর্ল্লভ প্রেমধন প্রদান করার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমেই প্রেমধন সর্বজীবকে বিতরণ করিয়াছেন, এই নবদ্বীপধামেই শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্তিত নাম সংকীর্ত্তন-এর আবির্ভাব। সুতরাং শ্রীগৌর নিজজনগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরধামের দর্শন সেবা ও পরিক্রমা করিতে পারিলে অবশ্য শ্রীগৌরসুন্দরেব কৃপালাভ হইবে। আমাদের পূর্বগুরু শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিপুলভাবে এই ধাম পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও গৌরধাম পরিক্রমারূপ ভক্তি অনুষ্ঠান মহাসমারোহে যাজন করিয়াছেন। দেহ গেহাসক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই ধাম পরিক্রমার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, যে কয় দিবস পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়, সেই কয় দিবস যাত্রিগণ ভগবৎ নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরধামের সেবা এবং শ্রীগৌড় ভক্তগণের দুর্ল্লভ সঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পায়। সুতরাং ঐ দিবসগুলি তাহাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা বড় ভাগ্যের কথা, তাহারা অত্যন্ত অনর্থগ্রস্ত

বশতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারে না, এই সমস্ত লোকেরও যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাদের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন তাহাদেরও শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হইবে এবং গুরুকৃপায় তাহাদের জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হইবে এবং নিরন্তর প্রেমামৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের বংশধরসূত্রে গৌড়ীয় ধারার আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া জগৎ জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ পূর্বক পরানন্দ প্রদান করিতেছেন। তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবদান্যতার শ্রোতধারা এখনও প্রবাহিত রাখিয়াছেন এবং এই শ্রোতধারা নিত্যকাল প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ বিজয়

বঙ্গদেশের অপর নাম গৌড়দেশ। "পূর্ব্বে গৌড়দেশের পশ্চিম অংশকে গৌড় বলা হইত" এবং পূর্ব্বাংশকে "বঙ্গদেশ" বলা হইত। গৌড় নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্বপ্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব ও দক্ষিণতটে যে স্থানে গঙ্গার পূর্বশাখা রূপ মূলপ্রবাহ পদ্মাবতীনদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগই তৎকালে বঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত।" (শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় ভাষ্য)। শ্রীহট্টজেলা তখন এই পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ঐ জেলার "ঢাকার দক্ষিণ নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম বর্তমান আছে। ঐ স্থানে

শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নামে একজন স্বনামধন্য ধনাঢ্য ভগবৎভক্ত বাস করিতেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ পর্জ্জন্যগোপের অবতার ছিলেন। কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ নামে ইহার সপ্তপুত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃত ভাষার উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। উত্তম মেধা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি 'পুরন্দর' নামক উচ্চ পদবী লাভ করিয়া সমগ্র নবদ্বীপ মণ্ডলে বিশেষ সম্মান লাভ করেন এবং বেলপুকুরিয়া নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্রের সর্বকনিষ্ঠ দশম সন্তানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধানের পর শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন লীলা সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা লীলা আরম্ভ করেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থগণকে বর্ণাশ্রমধর্মানুকুলে শুক্লবিত্ত অর্জন শিক্ষা দেবার জন্য সুদূর পূর্ববঙ্গে কতিপয় শিষ্যসহ ফরিদপুর জেলায় পদ্মাবতী নদীর তীরে মগতো নামক গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এখানে স্বীয় মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্ঞাতিগণ বাস করিতেন। এখনও পর্য্যন্ত ইহার জ্ঞাতি বংশ এখানে বাস করিতেছেন। সেখান হইতে পিতৃপুরুষগণের ভিটা এবং মিশ্র পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার ছলে তদ্দেশবাসীগণকে দর্শনদানে কৃতার্থকারী স্বীয় পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জন্মভূমি শ্রীহট্টজেলায় ঢাকা দক্ষিন গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বিবিধ লীলা বিলাস দ্বারা সর্বসাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে দেবদুর্ল্লভ মহাপ্রভূর দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়া সকলে কৃতকৃতার্থবোধ করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবন্ত সজ্জনগণ বিবিধ উপায়ন ও উপঢৌকন প্রদানপূর্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,—"আপনি অধ্যাপকগণের শিরোমণি আপনার নিকট

বিদ্যাশিক্ষার আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও এতদিন অর্থবিত্তসহ নবদ্বীপ গিয়া আপনার নিকট অধ্যয়ন করা আমাদের সকলের সৌভাগ্য হয় নাই; আপনি কৃপা করিয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছেন,—ইহা আমাদের মহাসৌভাগ্যের বিষয়। আপনি এখন অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু কলাপ ব্যাকরণের একটী চমৎকার টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শিক্ষার্থীগণ নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে ঐ টিপ্পনী শিক্ষা করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে গিয়া অন্য শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা দিতেন। তাই পুনরায় উহারা মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
বই' পড়ি পড়াই শুনহ, দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক তোমার কীর্তি সকল সংসারে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাদের প্রার্থনা শুনিয়া তথায় বিদ্যাবিলাসের জন্য দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন। উহারা বিবিধ উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্গুরু আশ্রয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত বিমুখ মোহনার্থে জড়বিদ্যাচর্চ্চা ও কলাপব্যাকরণের ঐ টিপ্পনীর অনুশীলন করিতেন; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পরে পরাবিদ্যা বিলাসের প্রারম্ভেই তাঁর জড়বিদ্যাচর্চ্চা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল এবং ঐ টিপ্পনীটীরও অন্তর্ধান হইয়াছিল। তাই বর্তমানে প্রভু রচিত টিপ্পনীটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে কৃপাবিতরণে ধন্য করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রদ্ধালু

সজ্জনগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্থ, বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি বহু মূল্যবান উত্তম উত্তম দ্রব্য-সমূহ প্রীতির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রদান করিলেন। এমন সময় শ্রীতপনমিশ্র নামক একজন সুকৃতিবান্ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে নিয়মিতভাবে গায়ত্রী মন্ত্রাদি জপ করিতেন, কিন্তু কিছুতেই চিত্তে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রকৃত 'সাধন' ও 'সাধ্য' কি তাহাই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কখন 'দান-পুণ্য-যজ্ঞ-তপস্যা-ব্রত' করিতেন, কখন জ্ঞানবৈরাগ্য চর্চ্চা করিতেন। আবার কখন বা 'ভগবৎ অর্চ্চন, ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা করিতেন। সকল প্রকার সাধন করিতে গিয়া কোনটাতেই নিষ্ঠা রাখিতে পারিতেছিলেন না। আরাধ্য বস্তু বিষয়ে কোন প্রকার একাগ্রতা ছিল না; শরৎকালে শারদীয়ামাতার পূজায় মাতিয়া উঠিতেন। শিবচতুর্দশীতে কৃচ্ছ্রব্রত করিতেন, শ্রীজন্মাষ্টমীতে নির্জ্জলা ব্রত রাখিতেন, রামনবমীতে উৎসব করিতেন, কখন ব্রহ্মের, কখন পর-আত্মার, কখন বা ভগবানের সাধন করিতেন। এ বিষয়ে সদ্ পরামর্শ দিবার উপযুক্ত কোন পাত্রও পাইতেছিলেন না। তিনি অত্যন্ত অশান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। যে বিষয়-সুখে জগৎবাসী প্রমত্ত সেই বিষয় সুখ তাঁহাকে কোন শান্তি দিতে পারিতেছিল না। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন, একজন দেবতা তাঁহার নিকট আসিয়া সেই নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ ও তত্ত্বের কথা জানাইলেন এবং উঁহার সমীপে গমন করিতে নির্দেশ করিলেন, আরও জানাইলেন,—নিমাই পণ্ডিত মনুষ্য নহেন, তিনি নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি 'সাধন' ও 'সাধ্য' তত্ত্বের নির্ণয় করিয়া পরাশান্তি প্রদান করিতে সমর্থ।

ঐ ব্রাহ্মন ঐপ্রকার স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলেন এবং সদৈন্যে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন,—প্রভো! কৃপাপূর্বক এ অধমের সংসার বন্ধন, ছেদন করুন এবং 'আমার আরাধ্য

দেবতা কে ?' 'কি উপায়ে বা তাঁহার আরাধনা করিব ?' কৃপাপূর্বক জানাইয়া আমার তপ্ত-প্রাণকে শীতল করুন।"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—সাধ্য সাধন তত্ত্ববিষয় জানিবার জন্য আপনার যে আকাঙ্খা হইয়াছে, ইহার দ্বারাই আপনার অবশ্য পরম মঙ্গললাভ হইবে।

"শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি-নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

কলিযুগে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধন। সাধনফলেই সাধ্যসার বস্তু "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম" অনায়াসে লভ্য হয়।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র সাধন। "এই বত্রিশ অক্ষরাত্মক ষোলটি নামই কলিযুগের মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক বিধানমতে এই মহামন্ত্রের "উচ্চকীর্ত্তন এবং জপ"—উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তাহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্ত্তন প্রভাবে কৃষ্ণ-প্রীতিবাসনার অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনাম প্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন তত্ত্বে পারদর্শী হন। 'ছড়ানাম' বা রসাভাসদুষ্ট নামাপরাধের চীৎকার অথবা মহামন্ত্রকে কোন জপ্যজ্ঞানে উচ্চকীর্ত্তন বিরোধী, তাহা কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবর্ত্তে, অপরাধই উৎপাদন করে। যাহারা এইরূপ নামাপরাধ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের হৃদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। এইরূপ গুরুদ্রোহী অপরাধিগণ মায়া শৃঙ্খলে ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া

৬

থাকে। ইহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে চিরতরে নিরয়গামী হয়।

মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল অনির্বদ্ধ কীর্ত্তনীয় নহেন। "সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" এই পদের দ্বারা কেবলমাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে।

তাই শয়নে স্বপনে, আসন্নকালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধান আছে।

"কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

* * *

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

মহামন্ত্র কীর্ত্তনে কালাকালের পবিত্রাপবিত্রের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। ইহা সর্বক্ষণ উচ্চারণে কোন প্রকার বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। শত শত জন্ম নিরপরাধে বীজসম্পুটিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা অর্চন করিবার ফলে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ হয়। তবে মহামন্ত্রে সিদ্ধি প্রাপ্ত মহাজনের নিয়ামকত্বে নিরপরাধে শুদ্ধ ভাবে নাম ভজন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে,—নতুবা শত শত জন্ম ভজন করিলেও সিদ্ধি হইবে না।

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।

মহাপ্রভুর সাধ্যসাধনাত্মক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীতপন মিশ্র তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীধাম মায়াপুর যাইতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তপনমিশ্রকে বারাণসীতে যাইবার আদেশ প্রদানপূর্ব্বক স্নেহালিঙ্গন করিলেন। তাঁহার আলিঙ্গন প্রাপ্তি মাত্রই প্রেমানন্দে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। তারপর মহাপ্রভু শুভলগ্ন দেখিয়া শিষ্যগণসহ অর্থবিত্তাদি লইয়া নিজগৃহ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উক্ত শ্রীতপনমিশ্র মহোদয়কে শ্রীহট্টজেলার "ঢাকা দক্ষিণ" গ্রামবাসী মিশ্র বংশের সন্তান বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় উপলক্ষে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমানুকূলে শুক্লবিত্ত দ্বারা পরিজন পোষণ করিতে শিক্ষা দিলেন। শুদ্ধভাবে অর্থ অর্জন করিতে প্রয়োজন হইলে সুদূরদেশেও যাওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গা হরিনাম বর্জ্জিত শোচ্য-দেশবাসীকে দর্শনদান ও কৃপা বিতরণ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি যে কুলে বা বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই ঢাকা দক্ষিন-বাসী মিশ্রগোষ্ঠীবর্গকে দর্শনদান করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করেন।" এখনও পর্য্যন্ত শ্রীহট্টবাসী হিন্দুগণ হাটে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্র সর্বাবস্থায় সর্বকর্ম্মে শ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সর্ব বঙ্গদেশ।
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে ॥

(ভক্তিপত্র ২।৩।১২)

———

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি—মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি পরমেশ্বর, তিনিই একমাত্র ভোক্তা। এই বিবাদমান ঘোর কলিকালে শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বরূপে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, ও শ্রীবাসপণ্ডিত স্বরূপে) অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরস ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সজ্জনদুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ প্রভৃতি সকলকেই অকাতরে প্রেম বিতরণ করিতেছেন,—ইহা দেখিয়া আত্মবঞ্চনে মহাদক্ষ মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন।

"এসব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥

*   *   *

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসি বুদ্ধ্যে ত মোরে প্রণত হইব ॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার ॥"

এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু লোক শিক্ষার্থ অসহায়া বৃদ্ধা শ্রীশচীমাতা ও নবকুলবধূ সাধ্বীপত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে মাঘশুক্ল—পক্ষে উত্তরায়ণ সংক্রমণ দিবসে কাটোয়ানগরে একদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিনয় করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর অনুসরণে পরমাত্মনিষ্ঠরূপ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে একদণ্ডী সন্ন্যাসীর ন্যায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" বিচারের লেশও ছিল না।

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

"প্রাচীন মহাজনের উপাসিত এই পরমাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষু আশ্রম আশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবন দ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তম আমি উত্তীর্ণ হইব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে নির্বিশেষ বিচার অবলম্বন করার ছলনা করিয়া মায়াবাদীগণের উপাস্য শ্রীবক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ সন্নিধানে নির্জ্জন কানন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদ হইতে সবিশেষবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইবার জন্য অকস্মাৎ কৃষ্ণভজনার্থ বৃন্দাবন অভিমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশচীমাতা ও নদীয়াবাসী ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে মিলন করাইবার জন্য কৌশল করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে আনয়ন করিলেন। শ্রীশচীমাতা, শ্রীবাসপণ্ডিতাদি অন্যান্য ভক্তগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তথায় আগমন করিয়া ন্যাসিকুল চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন পূর্বক বিরহতপ্ত-প্রাণ শীতল করিলেন। দশদিন পর্যন্ত ভক্তগণ সেখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত নৃত্যকীর্ত্তন মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক শ্রীশচীমাতার ইচ্ছানুসারে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দদত্ত ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে কি পথের সম্বল আনিয়াছ, তাহা আমাকে বল?" তদুত্তরে ভক্তগণ বলিলেন—"প্রভু! তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন সম্বল নাই।" তাঁহাদের মুখে ঐকান্তিক শরণাগতির বিচার অবগত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন, নিষ্কিঞ্চন

শরণাগত ভক্তগণ নিজের পোষণের জন্য বা রক্ষার জন্য কখনই চিন্তা করেন না। ভগবৎ সুখকর অনুষ্ঠান ছাড়া তাঁহাদের অন্যদিকে দৃষ্টি থাকে না। তাই ভগবান্ অনন্ত-শরণাগত ভক্তগণের ভরণ-পোষণ বা রক্ষণ নিত্যকালই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অরণ্যেও আহার্য পাওয়া যায়; আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে রাজপুত্রের ভাগ্যেও ভোজন মিলে না। যেমন রাজভোগ সম্মুখে উপস্থিত, হঠাৎ রাজপুত্রের ক্রোধের উদ্রেক বা শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার খাওয়া হইল না। ভগবান্ সর্বত্র অন্নছত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে সর্বত্র আহার মিলিবে। শরণাগত ভক্তের যোগক্ষেম তিনি সর্বদা বহন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমানন্দ কুতুহলে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে কমলপুরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়াই তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে করিতে ভক্তগণকে পশ্চাতে রাখিয়া একাকী নীলাচলে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামকে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমে বিহ্বল হইলেন। কমল-নয়ন শ্রীজগন্নাথদেব যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য লম্ফ দিয়া সিংহাসনে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মন্দিরাভ্যন্তরে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, পরিহারিগণ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল; দৈবাৎ রাজপণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত থাকায় পরিহারিগণকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমের বিকার দর্শন করিয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া অনুমান করিলেন এবং পরিহারিগণ-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে তাহার বাহ্যদশা হইলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বীয় ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ

আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহার সমস্ত পরিচয় অবগত হইলেন। কনককান্তি নবযৌবনসম্পন্ন সন্ন্যাসী বেশধারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহের উদ্রেক হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার জন্য শ্রীসার্বভৌম তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। একদিন দুইদিন ক্রমান্বয়ে সাতদিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শ্রবণ করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাল মন্দ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—বেদান্তের মূল সূত্র বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার নির্দেশে আমি শ্রবণ করিতেছি মাত্র। আপনি উপনিষদ প্রতিপাদ্য মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থেরই কল্পনা করিতেছেন।

"সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখান॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন উপনিষদ ও বেদান্ত সূত্রের নির্বিশেষ ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া সবিশেষবাদ স্থাপন পূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ভক্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিয়া জীবের মঙ্গলার্থে নিজের ও ভক্তগণের আচরণ দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, উহার কয়েকটি প্রসঙ্গ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) নির্বিশেষবাদী মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মহাপ্রভু স্বগোষ্ঠিতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে একজন প্রধান ভক্তরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত হইতে দেখিয়া রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্র প্রভৃতি নীলাচলবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অবগত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইলেন।

(২) ক্রমে ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা উড়িষ্যার নরপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত

হইয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট আবেদন জানাইলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষেধ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন—

"তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥"

তাঁহার এতাদৃশ উৎকণ্ঠার কথা ভক্তগণের নিকট শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন ও সেবা প্রদান করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি দর্শন করিয়া সমস্ত উড়িষ্যাবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া পড়িল।

(৩) রসিককুল চূড়ামণি শ্রীরামানন্দ-রায় বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। প্রেমভক্তির নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে মহাবক্তা বা মহা আধিকারিরূপে জ্ঞাপন করিলেন।

(৪) কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মীভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নীলাচলে আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়ীয় ভক্তগণের একমাত্র নিয়ামক ও ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের পরীক্ষকপদে নিযুক্ত করিলেন।

(৫) যবনকূলে আবির্ভূত শ্রীলঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু নামাচার্যপদে অভিষিক্ত করিয়া সিদ্ধ বকুলে স্থান প্রদান করিলেন এবং তাহার দ্বারা নাম-ভজনের আদর্শ শিক্ষা প্রদর্শন করাইলেন।

(৬-৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু বাংলার নবাব হোসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী শ্রীসনাতন গোস্বামীকে কৃষ্ণ-ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের আচার্যপদে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকে ব্রজপ্রেমরসের গুরুপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে শক্তি সঞ্চার-পূর্বক বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া গৌড়ীয় ভক্তিসাম্রাজ্যের অমূল্য-

সম্পদ সংরক্ষণ করিয়াছেন। উহাদের দ্বারা শ্রীব্রজমণ্ডলে,—এমনকি সমগ্র ভারতে ভাগবতধর্মের কথা প্রচার করাইয়াছেন।

(৮) বৈরাগ্যের বেশধারণ করিয়া যোষিৎ বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্যগ্ রূপে ভাষণ বা আলাপ-আলোচনা বা মেলামেশার ফলে যে ভীষণ সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাস দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

(৯) শ্রীদামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডে শ্রীমহাপ্রভু অন্তরে সুখী হইলেও গুরুর উপর 'গুরুগিরি' বা মর্যাদালঙ্ঘন করা শোভা পায় না,—এই শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে শ্রীশচী-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষকরূপে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইলেন।

(১০) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে কু-বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিয়ামকত্বে রাখিয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ সেবা প্রদান করিলেন এবং তাহার দ্বারা রাগমার্গীয় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া ভক্তিসাম্রাজ্যের অক্ষয় গৌরব বিস্তার করিয়াছেন।

(১১) শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমাস্পদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিরে লাগাইবার জন্য এক গাগরী সুশীতল সুগন্ধী চন্দন তৈল বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। বৈরাগী সন্ন্যাসীগণের সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না।"

"প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল, পরম ধিক্কার॥"

(১২) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি—খুড়া শ্রীকালিদাস ভক্তিভরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবন করিতেন। তাহার ফলে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হন। মহাপ্রভু নিজেই তাঁহার অবশেষ প্রসাদ কালিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সম্মান করিলে

অবশ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কালিদাসের দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই শিক্ষাপ্রদান করিলেন।

"বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥"

এই নীলাচলক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ গুরু শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায়-রামানন্দকে লইয়া সার্বভৌম ও সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য আস্বাদন করিয়াছেন।

"নাম সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥"

শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার নাম পৃথক নহেন। শ্রীনামে তিনি সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন। নামের এত করুণা সত্বেও নামাপরাধী ব্যক্তির ঐ নামের অনুরাগ হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম ভজনকারীর স্বভাব ও আচরণ জ্ঞাপন করিতেছেন—'নাম ভজনকারীর দৈন্য, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও অপরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপালাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে নাম করিতে করিতে তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। এক একটি নিমেষকাল তাঁহার নিকট এক একটি যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং কৃষ্ণের বিরহে ত্রিভুবন শূন্য বলিয়া অনুভব করেন। সম্পদে ও বিপদে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সর্বক্ষণ পরম বান্ধব বলিয়াই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

গম্ভীরায় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায়রামানন্দের সঙ্গে ব্রজের নিগূঢ় প্রেম রসালাপ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে, শ্রীবিগ্রহ-দর্শনানন্দ, শ্রীরথাগ্রে নৃত্য কীর্তন, গোবর্ধনাভিন্নচটক পর্ব্বত দর্শনে দিব্যোন্মাদ, সমুদ্রে যমুনাবোধে জলকেলি, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে সলিল বিহার প্রভৃতি লীলার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলের প্রতি রেণুতে রেণুতে আকাশে বাতাসে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বা ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শ্রীনীলাচলকেও মহাপ্রভুর নিত্যলীলানিকেতন বলিয়া জানেন। আমাদের গৌড়ীয় মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুবৎসর যাবৎ শ্রীনীলাচলে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ সেবা ও নাম ভজন করিয়াছেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির সন্নিকটে শ্রীনারায়ণ ছাতা-নিবাসে আবির্ভূত হইয়া "হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্র বাণী সার্থক পূর্বক সমগ্র বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদর্শিত গোবর্ধনাভিন্ন শ্রীচটকপর্বতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ নামে চৈতন্যবাণীর একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং নিজেও তথায় বহুকাল যাবৎ নাম ভজন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামীঠাকুরও পুরী পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করে বহুদিন ভজন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নাম ভজন করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে (নীলাচলে) শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বিবিধ সেবার প্রচুর ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। তিনি প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রায়, শ্রীস্নানযাত্রায় ও শ্রীরথযাত্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে ভক্তগণসহ নৃত্য কীর্ত্তন সেবা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রতিবৎসর গুণ্ডিচামন্দির মার্জন-সেবা সম্পাদন করেন। এই সময় তাহার শ্রীঅঙ্গে যে অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রত্যেক দর্শনকারীই অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীল গুরুমহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমধামের প্রতি মন্দিরে

মন্দিরে ভক্তগণসহ পরিক্রমায় গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার আচার্য-লীলার এই বিরাট অবদান বৈশিষ্ট্যের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে আজও বিবিধ লীলা করিতেছেন—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা

(১৯৬৬ খৃঃ জুন) শ্রীভক্তিপত্র

৪৮০ বৎসর পূর্বে ৮৯২ বঙ্গাব্দ ১৪০৭ শকাব্দ, ১৫৪২ সম্বৎ, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যা ৫টা৫২মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ কালে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীনবদ্বীপ থানায় শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাভাগবত প্রবর পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে জগজ্জননী শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শিশুরূপে ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিকীর্তন করাইয়াছিলেন, অঙ্গনে কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া শেষশায়ী লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গভীর রাত্রে তৈর্থিক বিপ্রকে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, দত্তাত্রেয়ভাবে জননীকে বেদের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছিলেন, উপনয়ন সংস্কারকালে বামনরূপে ভিক্ষাছলে নবদ্বীপবাসীগণকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সরস্বতী পতি নারায়ণরূপে দিগ্বিজয়ী-কাশ্মীরী

কেশবপণ্ডিতের বিদ্যা গর্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গে শ্রীতপনমিশ্রকে জগদ্গুরুরূপে সাধ্য-সাধন বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া পরমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, মহাপাতকী ব্রহ্মদৈত্য জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া 'পতিতপাবন' নামের সার্থক করিয়াছিলেন, এবং বিবিধ অলৌকিক ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকট করিয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের পরমানন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর অধ্যয়ন লীলাকালেই তদীয় পিতা শ্রীজগন্নাথমিশ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিরহে তিনি বিস্তর ক্রন্দন করিয়াছিলেন। অতঃপর নিজে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শোকাতুরা জননীকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন ;—

"শুন মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্লভ লোকে বোলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু ছলে॥"

শ্রীশচীদেবী মহাপ্রভুর কোটীচন্দ্র সুশীতল মুখচন্দ্র শোভা দর্শন করিয়া সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন। পিতৃহীন বালক-মহাপ্রভুর উপর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। তখন তিনি শুক্লবিত্তদ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়গৃহে একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়া ভাগ্যবন্ত শিশুদিগকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। জগতে আদর্শ গার্হস্থ্য-ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিবাহ-লীলা প্রকাশ করিলেন, এবং দীন, দুঃখী, অতিথি, অভ্যাগত, ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীগণ গৃহে আগমন করিলে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা আদর আপ্যায়ন পূর্ব্বক সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহস্থগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলেন।

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা-গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ

মাতাপিতা স্নেহবশতঃ সন্তানকে যেরূপ লালন পালন করেন, জগতে এরূপ স্নেহ আর কেহ করে না। এইজন্য সন্তানগণ মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত ঋণী থাকায় তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত সেবা করে, এমন কি তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অশৌচ গ্রহণরূপ কষ্ট স্বীকারপূর্বক শয়ন ভোজনের সুখ ত্যাগ করিয়া বৈদিক বিধানানুসারে পিতৃতর্পণ শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করে। কলিযুগ পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মকাণ্ডাসক্ত জীবগণের ক্রমমঙ্গল বিধানার্থে কর্মমার্গীয় পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়াতীর্থ যাত্রার অভিনয় করিলেন। তাহার এই লীলার দ্বারা জগদ্জীবকে শিক্ষা দিলেন যে,—যতদিন ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না হয়, এবং সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততদিন কর্মমার্গীয় বিধি সমূহকে অবশ্য পালন করিবে।

"তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

মহাভাগবত প্রবর শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্বেই মহাপ্রভু কর্মকাণ্ডীয় তীর্থশ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। কর্মকাণ্ডীয় পন্থাকে তিনি পরমার্থ বলিয়া প্রচার করেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্মের সাধারণ বিধিসমূহ লঙ্ঘন করিয়া পরমার্থের নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই

কর্মকাণ্ডীয়গণের অধিকারোচিত ধর্মযাজনের শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু এবংবিধ আচরণ করিলেন। পিণ্ডদানাদি কর্মকে মহাপ্রভু পরমার্থের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন নাই। ভক্তিমার্গ আশ্রয়ান্তে আর কর্মকাণ্ডের বিচারে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন নাই। তাই শুদ্ধ ভক্তগণ কর্মকাণ্ডের বিচারে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন নাই। তাই শুদ্ধ ভক্তগণ কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজন করিয়া থাকেন।

গয়াধামের রহস্য

অতি প্রাচীনকালে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে বেদ তাৎপর্যানভিজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ডিগণ বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডে প্রমত্ত হইয়া যজ্ঞাদির নামে জীবহিংসা করিয়া জীব-প্রভু বিষ্ণুকেই নির্য্যাতন করিতেছিল; এবং তৎকালে নাস্তিক চার্বাক ঋষি বলিলেন :—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগতং কুতঃ॥"

এই প্রকার 'ভোগবাদ' প্রচার করিয়া 'জন্মান্তরবাদ'কে সমূলে উচ্ছেদ করিতেছিল। সেই কালে বুদ্ধদেব অবতার গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম-বিচার-যুক্তির দ্বারা ভোগবাদ খণ্ডন করেন এবং কর্মকাণ্ডের জীবহিংসামূলক কর্ম্মকে অত্যন্ত দোষনীয় ও ঘৃণিত জানাইয়া 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এবং জড় নির্বাণবাদের বাণী প্রচার করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জড়নির্বাণবাদ খণ্ডন করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের চিদ্বিলাসরূপ সবিশেষবাদ উচ্ছেদন করে 'চিৎ-নির্বাণবাদ' ও 'নিরাকারবাদ' প্রবর্ত্তন করিলেন। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্যরূপ গয়াসুর বেদ বিরুদ্ধ 'জড়নির্বাণবাদ' বা 'নাস্তিক্যবাদাদি'কে প্রবলবেগে প্রচার পূর্বক বেদানু-মোদিত কর্ম্মকাণ্ডকে সমূলে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার প্রবল

আক্রমণ হইতে বেদানুগজনগণের ধর্মরক্ষার জন্য শ্রীগদাধর-বিষ্ণু গয়াসুরকে পদদলিত করিয়া তাহার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম, স্থাপন পূর্বক 'সবিশেষবাদ' সংস্থাপন করেন। ঋকবেদের 'ত্রেধা নিদধে পদম্' মন্ত্রের উদ্দিষ্ট শ্রীবামনদেব (বিষ্ণু) গয়াধামে অর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ চিদ্বিলাসময় সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের পাদপীঠের পূজা প্রবর্ত্তনের দ্বারা বৌদ্ধগণের জড়-নির্বাণবাদ, নিরাকারবাদ পঞ্চোপাসকগণের—'নির্বিশেষবাদ' শ্রীগদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত হইয়াছে। উহার ফলে বৌদ্ধগণ নির্বীর্য্য হইল বটে কিন্তু উহাদের ও কর্মকাণ্ডিগণের 'বিচারধারা' ভক্তিবিরুদ্ধই থাকিয়া গেল।

আজও শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম গয়াসুরের মস্তকে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছেন। পূজারী ব্রাহ্মণগণ শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মের মহিমা নিত্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—

"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন!
তিলার্দ্ধেক যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥
যোগেশ্বর সবার দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন!॥
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥"

ভগবৎ শ্রীপাদপদ্ম সেবোন্মুখ জীবের ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা ধ্বংস করিয়া 'ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি ভক্তি-বৃত্তি' জাগ্রত করাইয়া দেন। ঐ শ্রীচরণ সর্বশক্তি যুক্ত;

তিনি দর্শন, শ্রবণ, ভোজন, ঘ্রাণ, কীর্ত্তন, ভক্ত বিনোদন ও অসুরদলন প্রভৃতি করিতে সমর্থ, তিনি চিদ্বিলাসী। নির্বিশেষবাদকে বিদলিত করিয়া চিদ্বিলাস স্থাপন উদ্দেশ্যে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীগয়াধামে শ্রীভগবৎ পাদপদ্মের আবির্ভাব। এ বিষয়ে গরুড় পুরাণ ৮২-৮৬ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ (শ্বেঃ বঃ কঃ) ১-৮ অধ্যায় এবং অগ্নিপুরাণ ১১৪-১১৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণিত আছে।

তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল

ভক্তগণ যখন পাষণ্ডীগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নির্যাতিত হইতেছেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম' আশ্রয় ব্যতীত প্রেমভক্তি লাভ করা ত' দূরের কথা, ভববন্ধন হইতেও উদ্ধার পাওয়া যায় না'—এইজন্য লোকশিক্ষক মহাপ্রভু পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গয়া গমন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। সাধারণতঃ তীর্থে ভক্তগণ অবস্থান করেন, উঁহাদের দুর্ল্লভ-সঙ্গ লাভের জন্যই তীর্থগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়া গুরু-পদাশ্রয়ের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। পিতৃ তর্পণাদির জন্য গয়ায় গমন—তাঁহার গৌণ কারণ।

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর।
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।"

তীর্থ অপেক্ষা ভক্তের মাহাত্ম্য প্রাধান্য অধিক

পাপীগণ তীর্থস্নানাদির দ্বারা স্বীয় পাপ তীর্থে বিসর্জন করিয়া পাপমুক্ত হয়। এইপ্রকারে পাপমলিন তীর্থসমূহ অত্যন্ত পাপভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলে

উঁহারা পাপহারী শ্রীহরির পাদপদ্মে আকুল ক্রন্দন জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীহরির ইচ্ছানুসারে তদীয় নিজজন ভক্তগণ তথায় শুভাগমন করেন। তাঁহাদের পাদস্পর্শফলে তীর্থসমূহ পবিত্রীভূত হইয়া যান। এইজন্য তীর্থ অপেক্ষা গোবিন্দ পদাশ্রিত ভক্তের মাহাত্ম্য অধিক। যে সকল পিতৃপুরুষের নাম লইয়া তীর্থে পিণ্ড দেওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহারাই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ ভক্তগণের দর্শনমাত্রই অজ্ঞাতনামা উর্দ্ধতন কোটি কোটি পিতৃপুরুষগণ সদ্‌গতি লাভ করেন, পৃথক্‌ভাবে তাহাদিগকে পিণ্ডদানের প্রয়োজন হয় না।

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥

যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

তীর্থে গমন করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক সাধুসঙ্গ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তীর্থসমূহ চঞ্চলচিত্ত-বিষয়ীগণের চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত করিতে পারে না। সাধুসঙ্গ প্রভাবে 'চিত্তের স্থিরতা' লাভ ত' দূরের কথা, সর্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

লোকশিক্ষক শ্রীমহাপ্রভুর লীলা

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর গয়াধামে প্রবেশ করিয়াই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তীর্থকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃতর্পণান্তে চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে গিয়া তিনি দর্শন করিলেন—বিপ্রগণ বিবিধ স্তবস্তুতিমুখে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্রাদি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছেন। বিপ্রগণের স্তুতি

শ্রবণ করিয়াই মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্রীনয়নযুগল হইতে অবিচ্ছিন্ন গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। দৈবযোগে সেই সময় প্রেমময় কল্পতরুর আদি অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রেষ্ঠ একান্ত স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের তথায় শুভাগমন হইল। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই মহাপ্রভু ভক্তিভরে নমস্কার জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলে উভয়েই পরস্পর প্রেমাশ্রু-বারিতে স্নাত হইলেন। মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দের সহিত ঈশ্বরপুরীকে স্তুতি-মুখে বলিতে লাগিলেন,—

'আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়াই আজ আমার গয়া যাত্রা সফল হইল। কারণ যে সমস্ত পিতৃপুরুষগণের নাম উল্লেখ করিয়া তীর্থে পিণ্ড দেওয়া যায়, কেবলমাত্র তাঁহারাই ভবসিন্ধু হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন, কিন্তু আপনার ন্যায় ভগবৎ নিজজন মহাভাগবতগণের দর্শন প্রভাবে যে সকল উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষগণের নামাদি অজ্ঞাত, তাদৃশ কোটী কোটী পিতৃপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হন। এইজন্য তীর্থ হইতেও পরমভক্ত আপনাদের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য অধিক। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলাম, আমাকে সংসার সমুদ্র হইতে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত মধু পান করান,— ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত প্রার্থনা।'

এবংবিধ স্তুতি শ্রবণ করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন— "ওহে পণ্ডিত! তোমার পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য, চরিতৈশ্বর্যের দ্বারা তোমাকে ঈশ্বর বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। আমি গত রজনীতে তোমাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, এখন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্বপ্নের ফল লাভ করিলাম। কি কহিব নিমাই পণ্ডিত! তোমার দর্শনে আমি সর্বক্ষণ পরমানন্দ অনুভব করি! নবদ্বীপে যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি, সেই সময় হইতে আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। নিরন্তর তোমার স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে। অতি

রহস্যজনক একটি সুসত্য কথা তোমাকে বলিতেছি,—তোমাকে দর্শন করিয়াই কৃষ্ণ দর্শনসুখ সর্বদা অনুভব করিতেছি।" শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের অতি সুসত্যবাণী শ্রবণ করিয়া দৈন্য বিনয়ের সহিত হাস্য করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা।"

কর্মকাণ্ডিগণের বিচারে তীর্থে আগমন করিলে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণের পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়াই ফল্গুতীর্থ প্রেতগয়া, রামগয়া, যুধিষ্ঠিরগয়া, ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া, ষোড়শীগয়াতে শ্রদ্ধার সহিত পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডপ্রদান করেন। অতঃপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া গয়াসুরের শিরোদেশস্থিত শ্রীবিষ্ণুর পদযুগলে পিণ্ড প্রদানপূর্বক মালাচন্দন দ্বারা অর্চ্চন করিলেন। বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু 'পিতৃতর্পণ' আদি কর্ম কাণ্ডীয় বিধি পালন করেন নাই। মহাপ্রভু তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টবাক্যে সন্তোষবিধান পূর্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনরত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক পরমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। শ্রীপুরীপাদ সহাস্যে কহিলেন,—"ওহে পণ্ডিত আমি অতি উত্তম সময়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। মহাপ্রভু অতি আনন্দের সহিত দৈন্য বিনয়ভাবে কহিলেন—আজ আমার বড় ভাগ্যের উদয় হইয়াছে। আপনি কৃপাপূর্বক অন্ন গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" শ্রীপুরীপাদ বলিলেন—"আমি ইহা ভোজন করিলে তুমি কি খাইবে?" মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—"আমি এখনই পুনরায় রন্ধন করিব।" শ্রীপুরীপাদ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"দেখ! এখন আর পুনরায় রন্ধন করিবে কেন, যে অন্ন আছে তাহা দুইভাগ কর, একভাগ আমাকে দাও আর অপর ভাগ তুমি গ্রহণ কর।" এ কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সহাস্যে নিবেদন করিলেন,—"আমাকে যদি কৃপা করিতে চান, তবে এখন যে অন্ন হইয়াছে তাহা কৃপাপূর্বক আপনি গ্রহণ

করুন। আমি অতি সত্বর পুনরায় অন্ন রন্ধন করিব। আপনি সঙ্কোচ না করিয়া কৃপাপূর্বক এই অন্ন গ্রহণ করুন। এই বলিয়া মহাপ্রভু সেই অন্ন ব্যঞ্জন আদি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন এবং শ্রীপুরীপাদও অতি আনন্দমনে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। এই অবসরে শ্রীরমাদেবী অতি অলক্ষিতে মহাপ্রভুর জন্য অন্নাদি রন্ধন করিয়া দিলেন এবং মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া স্বহস্তে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সর্বাঙ্গে দিব্যগন্ধ লেপন করিয়া দিলেন।

"দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।"

ভগবৎভক্তের সেবা করিলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয়। তাই স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর নিজে ভক্তের সেবা করিয়া জগৎবাসীগণকে ভক্তের সেবা করিতে শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বলিলেন, "এখানে আপনার ন্যায় শুদ্ধ ভক্তের দর্শন লাভ করিয়া আমার গয়াতীর্থে আসা সার্থক হইল।"

দীক্ষাগ্রহণ লীলা

একদিন মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে নিভৃত পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা পাইবার জন্য অতিদীনতার সহিত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কহিলেন—"মন্ত্র বলিয়া কি কথা, তোমাকে আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু গুরুদেব শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে পরিক্রমা করিয়া নিজ কায়-মন-প্রাণ সর্বস্ব নিবেদন করিলেন এবং নিজেকে কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রে সর্বদা নিমজ্জিত রাখিবার জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আবেদন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বিনীত নিবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রীপুরীপাদ মহাপ্রভুকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। যখন উভয়েই প্রেমাসিক্ত হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন,

লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর নিজে সদ্‌গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া জগজ্জীব-গণকেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণের শিক্ষা প্রদান করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু একান্তে বসিয়া যখন মন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধ কৃষ্ণদাসরূপ আশ্রয় ভাবান্বিত হইয়া করুণাপ্লুত উচ্চরবে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—বাপ কৃষ্ণ! তুমি আমার জীবন। আমার প্রাণ চুরি করিয়া এখন তুমি কোথায় গমন করিয়াছ? আমাকে দর্শন প্রদান করিয়া এখন কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছ?"—এইরূপে আর্তনাদ করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হইয়া গেল। যিনি পূর্বে পরম গম্ভীর ছিলেন, তিনি এখন কৃষ্ণবিরহ আবেশে পরম অস্থির হইলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া বিলজ্জভাবে উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে তাঁহার ছাত্রগণ অতিমিষ্টবাক্যে মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি উহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া নিজে সংসার পরিত্যাগপূর্বক প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন লালসায় মথুরায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ছাত্রগণ নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহী মহাপ্রভু অসহ বিরহ তাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া আকুলস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে শেষরাত্রে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূরে গমন করার পর তিনি আকাশ হইতে দিব্যবাণী শ্রবণ করিতে পাইলেন —"ওহে দ্বিজমণি! এখন তুমি মথুরায় গমন করিওনা,—নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন কর। যখন ব্রজগমনের সময় হইবে, তখন যাইবে। ওহে বৈকুণ্ঠপতি! জীব কল্যাণার্থে তুমি এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী জনগণকে তুমি হরিনাম প্রেমধন বিতরণ করিবে। শিব, বিরিঞ্চি, অনন্ত আদি দেবগণ যে প্রেমামৃত পানে মত্ত তাহা তুমি আপামর সর্বসাধারণকে অকাতরে বিতরণ করার জন্য এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমরা তোমার দাস, তাই তোমার

শ্রীচরণে ইহা নিবেদন পূর্বক স্মরণ করাইয়া দিলাম। ওহে প্রভো! তুমি সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তোমার 'নিরঙ্কুশ ইচ্ছা' দুর্লঙ্ঘনীয়। এমন কাল বিলম্ব না করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া যাও, পরে যখন যাইবার সময় আসিবে তখন মথুরা দর্শনে যাইবে।" আকাশ হইতে এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মথুরাগমনে বিরত হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রেমিক ভক্ত ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে "দীক্ষাগ্রহণ" লীলায় পরে মহাপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করিলে তাঁহার হৃদয়ে নবনবায়মানরূপে কৃষ্ণবিরহ প্রেমানন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

আত্মপ্রকাশের আসি' হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তি বিজয়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট-বিজয়

শ্রীহট্ট জেলার সদর থানায় ঢাকা দক্ষিণ নামক একটি সমৃদ্ধ শালী ব্রাহ্মণ বহুল গৃহস্থগণের বাসস্থান ছিল। ইহাদের মধ্যে মধুকর মিশ্রনামক একটি বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রমিশ্র তিনি বৈষ্ণব পণ্ডিত ও বহু সদগুণান্বিত ছিলেন, এই উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র কংসারী, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোক নাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় "পুরন্দর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপেই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশচীদেবীর পাণি

গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন।

শচীদেবীর একে একে ৮টী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে তাঁহার বিশ্বরূপনামে নবম পুত্র সন্তান আবির্ভূত হন, দশম পুত্র রূপে কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান গৌরহরি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে ৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার পৌর্ণমাসী সিংহলগ্নে, সিংহরাশিতে আবির্ভূত হন, তিনি কৌমার কাল হইতেই নিজ ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

তৈর্থিকে বিপ্রকে অষ্টভূজ দর্শন, অদ্বৈত আচার্য্যকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ পূর্বক সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ পূর্বক ভক্তগণকে বর প্রদান, চাঁদ কাজীকে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক ভয় প্রদান, মুরারি গুপ্তকে রামরূপ প্রদর্শন, যজ্ঞসূত্র গ্রহণ কালে ভক্তগণকে বামনরূপ প্রদর্শন, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়ভূজ প্রদর্শন, শ্রীরায়রামানন্দকে রসরাজ মহাভাবরূপ প্রদর্শন, এবং আরও অনেক ভক্তগণের নিকট স্বীয় অবতারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু বাল্যকালে ব্রহ্মচারীরূপে বিদ্যা অধ্যয়ন, গঙ্গাস্নানকালে সাজি ধুতি বহিয়া ভক্তগণের সেবন, পিতামাতা গুরুজনের আজ্ঞা পালন, যৌবন প্রারম্ভে গৃহিণীর পাণিগ্রহণ, সদবৃত্তির (অধ্যাপনা বৃত্তি) দ্বারা অর্থ অর্জন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি সেবা, শিক্ষাদান, তারপর সন্ন্যাস গ্রহণান্তে সর্বতোভাবে হরিসংকীর্তন ও ভক্তসংগে হরিকথা আলোচনামুখে পরমার্থ জীবন যাপন প্রভৃতি লীলা করিয়া জগত জীবকে পরমার্থলাভের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

তিনি গৃহস্থলীলাকালে পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট আদি স্থানে ভক্তগণকে দর্শন প্রদানার্থে কতিপয় শিষ্য সহ তথায় গমন করেন।

তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে ইচ্ছা হইল তান॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৪৯)

তবে প্রভু কত আপ্তশিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৫২)

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৬৬)

নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি!
আসিয়াছেন সর্বদিকে হৈল ধ্বনি॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৬৮

ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন হস্তে আইলেন সেই ক্ষণ॥
সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহাস॥
আমা সবাকার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে॥
অর্থ বৃত্তি লই সর্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সবার দুয়ারে॥
মূর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥

বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু চিত্ত বিত্ত॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সবাকারে॥
উদ্দেশ্য আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সবাকারে।
থাকুক তোমার কীর্তি সকল সংসারে॥
হাঁসি প্রভু সবা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কতদিনে বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাই পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপাদৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্॥
কত শত শত জন পদবী, লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৬৯-৯৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট-বিজয়

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর হইতে পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে।

গৌড়দেশের পূর্বাংশকে গৌড়দেশবাসীগণ বঙ্গদেশ বলিয়া পৃথক ভাবে অভিহিত করেন। গৌড়দেশের নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্বপ্রান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ ও পূর্বতট যেস্থানে গঙ্গার পূর্বশাখা রূপী মূল প্রবাহ পদ্মাবতী নদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে সেই স্থান পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগই তৎকালে বঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে— রত্নাকারং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রান্তগংশিরে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বাসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের রাজধানী নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র ও তদুত্তর পশ্চিমবর্তী প্রদেশ কর্ণ সুবর্ণ পশ্চিমবঙ্গ গৌড় ও রাঢ়, বর্তমান পূর্ববঙ্গ বঙ্গদেশ এবং উৎকল প্রান্ত দক্ষিণ বঙ্গ সমতট ও তাম্রলিপ্ত নামে অভিহিত হইত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহে ও পূর্ব ও মধ্য বঙ্গই বঙ্গদেশ নামে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবরের প্রধান অমাত্য আবুলফজল তৎকৃত আইনই আকবরী নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে বঙ্গের পূর্বতম হিন্দুরাজগণ তথাকার নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার আল বা বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন বলিয়া 'বঙ্গাল' (আলযুক্ত বঙ্গ) নামের উৎপত্তি হইয়াছে—(চৈতন্যভাগবতের আদি ১৪।৪৯ এর গৌড়ীয় ভাষ্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয় কারন ঐসব স্থানের অধিবাসীগণের মাতৃভাষা বাংলা ছিল, এমনকি এতাবৎকাল শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা আসামেয় অন্তর্গত থাকিলেও এতদ্দেশবাসীগণ বাংলাভাষাকে নিজ মাতৃভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ দর্শন উপলক্ষে শ্রীহট্টে ঢাকার দক্ষিণ গ্রামে শুভ বিজয় করিয়া মিশ্রবংশ কৃতার্থ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে তপনমিশ্র নামক একজন মিশ্র বংশীয় স্বধর্ম-নিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু শাস্ত্র চর্চা করা সত্ত্বেও জীবনে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধ্য সাধন বিষয়ে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতে ছিলেন না। তিনি একদিন স্বপ্ন যোগে একজন পুরুষকে বলিতে শুনিলেন—নবদ্বীপ হইতে আগত নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তোমার প্রশ্নের সমাধান হইবে। তিনি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিবেন, এই কথা শুনিয়া পরদিন সকালে ঐ ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিতের সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রণামান্তে বিনয়ের সহিত সাধ্য-সাধন বিষয়ে জানিতে চাহিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার ঐকান্তিকতা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বিপ্র। তুমি মহাভাগ্যবান্ আত্যন্তিক মংগল লাভের উপায় এবং উপেয় কৃষ্ণপ্রেম লাভের ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। সেই কৃষ্ণ ভজনের বিষয় শাস্ত্রে যা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর—

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিনে নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য॥
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৭-১৪৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের পরম মংগলময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীতপন মিশ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া নাম সেবা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে, পরমসাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা প্রেমলাভ করার একমাত্র উপায় নিরপরাধে শ্রীনামের শ্রবণ কীর্তন সেবা।

এইরূপে শ্রীহট্টবাসি ভক্তগণকে তথা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে কৃপা করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত সেবা উপকরণ সঙ্গে লইয়া মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গৌরসুন্দর যেমন শ্রীহট্টবাসীদিগকে অত্যন্ত আপন বোধ করিতেন, সেই প্রকার শ্রীহট্টবাসিরাও তাহাকে প্রীতি করিতেন, শ্রীহট্ট হইতে (পূর্ববঙ্গে) প্রত্যাবর্তন কালে তাহারা অনেক প্রকার যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন।

তবে গৃহে প্রভু আসিবেন হেন শুনি।
যার যেন শক্তি, সর্বে দিলা ধন আনি॥
সুবর্ণ রজত, জল পাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বর্ণন॥

উত্তম পদার্থ যত ছিল, যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১০-১১৪)

মহাপ্রভু শ্রীহট্ট হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর নবদ্বীপে অবস্থিত শ্রীহট্টবাসিদের নিকট তৎদেশীয় ভাষা অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতেন ইহা শুনিয়া শ্রীহট্ট বাসীরা মহা প্রভুর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে অয় অয়।
তুমি কোন্ দেশি, তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
কহ দেখি শ্রীহট্টে না জন্ম হয় কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর, কোন যুক্তি ইথে হয়॥
যত যত বলে, প্রভু, প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সেদেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ, না হয় প্রচুর॥
মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।

নাগালি না পায়, যায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার স্থানে।
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেওয়ানে ॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেই ক্ষণে ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৫।১৮-২৬)

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রভৃতি অনেকের শ্রীহট্টে জন্মস্থান ছিল। পরবর্তীকালে আজ পর্য্যন্ত অনেক শ্রীহট্টবাসী গৃহস্থ ও ত্যাগী ভক্তগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্বক শ্রীহরিভজন করিয়া আসিতেছেন, ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়। তাহারা মহাপ্রভুকে আমাদের শ্রীহট্টিয়ার প্রাণ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, তাহা এতৎ অঞ্চলের প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি গ্রামে গ্রামে ভক্তগণ গৌরাঙ্গের মন্দির ও আখড়া স্থাপন করিয়া গৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত হরি সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন, গৌরসুন্দরের একান্ত ইচ্ছায় এতৎ অঞ্চলের ভক্ত বৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের শুভেচ্ছায় কাছাড় জেলাস্থ লালা শহরে শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে শ্রীহট্টবাসি ও কাছাড়বাসী ভক্তগণ সাধ্যাতীত ভাবে অর্থ দ্রব্যাদির দ্বারা প্রচুর সেবা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। এই লালা শহরটীর চতুর্দিকে বহু শ্রীহট্টবাসি ভক্তগণ রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য শ্রীহট্ট হইতে এতৎ অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতেছেন, ঢাকার দক্ষিণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীহট্টবাসীর প্রাণধন 'মহাপ্রভুর বিগ্রহ' অধুনা কাছাড় জেলার 'শ্রীকনা' নামক স্থানে সেবিত হইতেছেন।

আর একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে বর্তমানে গৌড়ীয় মিশনের

প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়লোমি মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ গোড়ীয় মঠে তাঁহারই হৃদয়ের ধন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য সুবিশাল কারুকার্য্য খচিত নবচূড়া, বিশিষ্ট নবমন্দিরে অদ্য ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৮৮, বঙ্গাব্দ ১১ই নভেম্বর ১৯৮১ খৃঃ বুধবার সর্বসাধারণের সেবাগ্রহণার্থে প্রকটিত হইলেন। গুরুবৈষ্ণবগণ কর্তৃক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক গুরুবৈষ্ণব সেবাপ্রাণ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজ মিশনের কতিপয় উৎসাহী সেবকগণের সহিত আপ্রাণ সেবা চেষ্টার দ্বারা এই সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণের আনুকূল্য সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন তিনি মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ শ্রীহট্ট জেলার 'হবিগঞ্জ' মহকুমাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারাই শ্রীহট্টের গৌরব বর্দ্ধনার্থে এবং শ্রীহট্ট বাসীর আনন্দ বিধানার্থে মহাপ্রভুর বিমল প্রেম ধর্মের কথা আচার প্রচার মুখে জগতের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য শুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করাইয়াছেন। এই মন্দির আদি নির্মাণ অর্থে শ্রদ্ধানুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রদ্ধালু সজ্জন গণ সেবানুকূল্য করিয়াছেন তাঁহার জন্য আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল কামনা করি।

২৫শে কার্ত্তিক ১৩৮৮ সাল
শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয়মঠ
লালা-কাছাড়-আসাম।

শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্যলীলা

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(চৈঃ চঃ ১১।৫৩)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী দাতাশিরোমণি, সর্বঅবতারী অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ, গৌরকান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

উপনিষৎগণ যাহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি ইঁহার অংশ স্বরূপ এবং যাহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনিই এই শ্রীচৈতন্যদেব। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। জগতে যতপ্রকার বদান্যতা বা দানের কথা আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই, উহা অনিত্য এবং উহার ফলও অনিত্য। অন্নদান, বস্ত্রদান, কন্যাদান, বিদ্যাদান প্রভৃতির বিষয়ে শাস্ত্রে খুব প্রশংসা করিয়াছেন, এবং জগতে ইহাদের প্রচুর বহুমানন হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত দানে তৎকালিক উপকার হয় বটে, কিন্তু নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। চিরতরে অভাব

যায় না, বরং আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্দ্ধনই হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রকার ক্ষুদ্র অনিত্য দান বিতরণের জন্য জগতে আসেন নাই। রাম, নৃসিংহ, বরাহ, ও বামনাদি ভগবানের অন্যান্য অবতারে জগজ্জীবগণকে যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বদান্যতার পূর্ণতা হয় নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান সর্ব্ব অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবপ্রতি যে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন তাহাতেও বদান্যতার পরিপূর্ণতার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ অঘ, বক, পূতনা কংস, শিশুপালাদি নাস্তিক অসুরপ্রকৃতি জনগণকে প্রাণ বিনাশ করিয়াই ধরিত্রীর পাপভার লাঘবরূপ দয়া করিয়াছেন বটে, কিন্তু উঁহাদের চিত্ত শোধন করেন নাই। কিন্তু পরমকরুণাময় শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় বদান্যতাই সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দীন, হীন, সুনীচ, পতিত, পাষণ্ডী, অক্ষজজ্ঞান প্রতারিত জনগণের পাপ মলিন চিত্ত শোধন করিয়া অযাচিতভাবে সুদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতা জগতের অমূল্য সম্পত্তি স্বরূপ। এই প্রকার দানের কথা কেহ কখনও শ্রবণও করেন নাই, বিতরণ ত দূরের কথা।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ (নঃ) শচীনন্দনঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের দানের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রসস্বরূপ স্বীয় প্রেমভক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইহা জীবাত্মার শুদ্ধ স্বরূপের স্বাভাবিক ধর্ম, কৃত্রিম সাধন প্রণালীর দ্বারা লভ্য নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জীবের বিরূপ অবস্থা বিদূরিত করিয়া জীবকে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং এই অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া মহাবদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রবর্তন শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার একটি নিদর্শন।

এই কৃষ্ণ সংকীর্তন দ্বারাই (১) চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জন (২) সর্ব্বানর্থবিনাশন (৩) সর্বশুভলাভ (৪) পরবিদ্যার পরিসমাপ্তি (৫) সেবানন্দবর্দ্ধন (৬) অনুক্ষণ পূর্ণামৃত আস্বাদন ও (৭) প্রেমামৃত সমুদ্রে সর্বাত্মার মজ্জন হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব অচৈতন্য বিমুখ জীবের চেতনতা উদ্বোধন করিয়া উহাকে পরিপূর্ণ চেতন শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নিরস্তকুহক সত্যের প্রচারক তোষামোদী মনোহারী, কর্ণ রসায়ন বাক্য দ্বারা দল বৃদ্ধিকারী বা জনসংগ্রহকারী নহেন। জগতের প্রত্যেক জীবের এক একটা 'মনগড়া' মত থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সেইপ্রকার মন কল্পিত নহে, উহা শাশ্বত সনাতন এবং নিত্যমঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্র সিদ্ধান্তযুক্ত। ইহা সর্বদেশ সর্বকাল ও সর্ব পাত্রের উপযুক্ত। শুধু বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর জন্য নহে, ইহা আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশবাসী, এমন কি সোম, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহবাসী প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলকর। জগতের জাতি সকল যে সমস্ত কথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনময়ী বীর্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া উপলব্ধি করিলে, সেই সমস্ত কথা দুর্বলা বলিয়া বোধ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের মহা-মহাবদান্যলীলার কয়েকটি জলন্ত উদাহরণের বিষয় শ্রবণ করিলে ইহার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তাঁহার কৃপায় এই স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবির খাস।
রাজ্য পদ ছাড়ি করে অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদিপদ সুখ করি মানে।

ভক্তিসুখ মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ সুখো অল্পমানে কৃষ্ণ অনুচরে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১১১-১১৫)

(১) বিদ্যাগর্ব্ব নাশান্তে তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণবত্ব দান

কেশব কাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিদ্যাগর্বে গর্বিত হইয়া যখন শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিতে আসিলেন, অমানি মানদ বিগ্রহ শ্রীমন্মাহাপ্রভু তার জড় অভিমান বিদূরিত করিয়া জীব স্বরূপের নিত্য শুদ্ধ ভগবৎদাস্য অভিমান জাগ্রত করাইয়া দিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ।
তৃণ হইতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩—১৮৭+১৮৮)

(২) সাধ্য-সাধন তত্ত্বানভিজ্ঞ, শ্রীনাম ভজনানন্দ দান

সাধ্য-সাধন তত্ত্বাভিলাষী, বিষয়বাসনাতপ্ত হৃদয় পূর্ববঙ্গবাসী তপন মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "পরানন্দ সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন।"

(৩) যবনকুলোদ্ভূতকে "নামাচার্য্যে" প্রতিষ্ঠিত

যবনকুলে অবতীর্ণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া নামাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি ॥"

(৪) মহাপাপী দস্যু প্রকৃতির মদ্যপ জগাই মাধাইকে মহাভাগবতে পরিণত:—

দস্যু প্রকৃতির জগাই মাধাইয়ের পাপকলুষিত হৃদয়কে বিশুদ্ধ নির্মল করিয়া, মহাপ্রভু নির্মৎসর ভক্ত জীবনে পরিণত করিয়াছেন।

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোঁসাই।

• • •

দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

(চৈ: ভা: ম: ১৩।৩১১-৩১৩)

কারশক্তি বুঝিতে চৈতন্য অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত ॥

(৫) হিন্দুবিদ্বেষী বিধর্ম্মীকাজীকে "ভক্ত পরিণত"

হিন্দু বিদ্বেষী বিধর্ম্মী কাজীর মাৎসর্য্য হৃদয়কেও নির্ম্মৎসর ভক্তহৃদয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই কাজী নিজমুখে প্রভুকে বলিয়াছিলেন।

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যেন তোমাতে রহু মতি ॥

(চৈ: চ: আ: ১৭।২২০)

(৬) মায়াবাদী বৈদান্তিক সার্ব্বভৌমকে মহাভাগবতে পরিণত—

মহাবৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের মায়াবাদ বিচার দূর করিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা সার্বভৌম স্বীয় মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেই অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহ পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২১৩-২১৪)

(৭) গলিত কুষ্ঠ বিপ্রকে রোগমুক্তান্তে "ভক্ত জীবনে পরিণত"

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক, শ্রীগৌরহরি কুষ্ঠরোগ বিদূরিত করিয়া সুন্দর শরীর প্রদান করিয়াছিলেন। তখন সেই বিপ্র প্রভু কৃপায় তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভক্তি যাজন করিতে লাগিলেন।

(৮) নিন্দুক অমোঘকে প্রেমানন্দ দান—পরম নির্মৎসর সেবক বৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু মাৎসর্য্যপরায়ণ বিষুচিকাক্রান্ত নিন্দুক অমোঘ বিপ্রকে রোগমুক্ত ও অপরাধমুক্ত করিয়া প্রেমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

(৯) মায়াবাদী কঠিনচিত্ত সন্ন্যাসীগণকে পরম বৈষ্ণবে পরিণত—

শ্রীগৌরহরি সর্বোপরি মহাপরাধী কঠিন হৃদয় মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণকেও উদ্ধার করিয়া পরম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে নাচে গায়, করয়ে নর্ত্তন।
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।

বারাণসী পুরী প্রভু করিলা নিস্তার ॥
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৮-১৬০)

(১০) **বন্য পশু পক্ষীকেও প্রেমদানলীলা**—স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর ঝারিখণ্ডের বন্য হিংস্র ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর, মৃগ, ময়ূরাদি মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহকে পরস্পর হিংসা প্রবৃত্তি বিদূরিত করাইয়া শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপত্মা প্রকট করাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে।

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৪০)

ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৪২)

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥
'হরি বোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি ॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৪৪-৪৬)

এইজন্য ভক্তরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু পরম উল্লাসে জানাইয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮।১৫-১৮-২০)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু আর নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া, করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি করে বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।

তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৭ ৮৯-৯৮-১০০)

এই জন্য শ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মহাবদান্য রূপে এই প্রকার বন্দনা করিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৫৩)

শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব

(১০শে পৌষ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ—৪ঠা জানুয়ারী—১৯৬৭)

যিনি শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞানান্ধকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিদূরিত করেন এবং তাহাকে ভগবৎ সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তিনিই প্রকৃত 'গুরু'। তিনিই শিষ্যের পরম দেবতা ঈশ্বর বা প্রভু। একদিকে তিনি পরম পূজ্য-সম্ভ্রমের পাত্র, অপরদিকে তিনি পরম প্রীতির পাত্র পরমবান্ধব, বড় আপন জন। এই বিবদমান বিপদ সঙ্কুল বিশ্বে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র হিতাকাঙ্খী। তিনি প্রেয়ঃ পন্থীদিগকে শ্রেয়ঃ পন্থায় পরিচালনা করেন। নরকগামিগণকে গোলক গমনের মার্গ প্রদর্শন করেন।

গুরুদেব 'লঘুবস্তু' নহেন। তাঁহার সর্ব কার্যেই গুরুত্ব আছে। তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন সবই 'গুরু'। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সর্বগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার বক্তব্য, শ্রোতব্য, স্মর্তব্যের বিষয়। তিনি কৃষ্ণ বৈ জানেন না, 'কৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, 'কৃষ্ণের কথা' ছাড়া আর কিছু

বলেন না বা অপরকেও বলান না; এমনকি কৃষ্ণসেবা ছাড়া ইতর কার্যে অন্যকে নিযুক্ত করেন না।

গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগানদার, নিজে সর্বক্ষণ সেবা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাই তিনি পরমভোক্তা বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ও তাঁহার ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য সেবক সংগ্রহকার্যে বিশেষ চেষ্টা বিশিষ্ট। তিনি সেবা বিলাসী বৈরাগী নহেন, শিষ্যদিগকে ভগবৎ-সেবা শিক্ষাই প্রদান করেন; সেবার অনুকুলে জীবনযাপন করিতে বলেন। ভগবৎ সেবানুকুল বিষয়কে নিজেও ত্যাগ করেন না বা শিষ্য দিগকেও ত্যাগ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন না। সেবাবিহীন মর্কট বৈরাগ্যকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন; তবে সেবার নাম করিয়া বিষয় ভোগ করিতে বলেন না। গুরুদেবের অকৃত্রিম কৃপা ছাড়া এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত কেহ বুঝিতে পারে না।

প্রত্যেকের একটা অভিমান আছে। ঐ অভিমান থাকার জন্য কেহই নিজেকে ছোট বলিয়া জানিতে পারে না। অতি নগণ্য 'তৃণ' টী পদদলিত হইলেও পর মূহুর্তেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে চায়। কীট পতঙ্গ হইতে দেবতা পর্যন্ত কেহই ছোট থাকিতে চায় না; কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না; সকলেই চান বড় হইতে, স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে। কিন্তু ভগবৎ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সর্বগুণাধার হইয়াও নিজেকে দীন হীন কাঙ্গাল বলিয়া সর্বক্ষণ অভিমান করেন। ইহাই তাঁহার গুরুত্বের বৈশিষ্ট্য। গুরুদেবের দৈন্যের মধ্যে কপটতা নাই। প্রেষ্ঠ হইয়াও নিজেকে নিকৃষ্ট বোধ করিতে পারেন বলিয়াই তিনিই "গুরুবস্তু"। 'দৈন্য' শরণাগতির একটা অঙ্গ। এইজন্য শরণাগতির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে স্বাভাবিকভাবে এইরূপ 'দৈন্য' বিদ্যমান থাকে। 'পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ' এইরূপ দৈন্যবোধ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত থাকে।

শ্রীগুরুদেব 'সহিষ্ণুতার' জ্বলন্ত আদর্শ। তাঁহার 'সহিষ্ণুতা গুণে মুগ্ধ

হইয়া ভগবানকেও নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। জগদ্গুরু নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ হইতে রক্তপাত হইতেছে দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ ঘাতী মাধাইকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়া সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে মাধাইয়ের জীবন ভিক্ষা করিলেন। পরম নির্মৎসর দয়াল নিতাই ঠাকুর অযাচিত ভাবে মাধাইকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করায় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব যদি এ জগতে প্রকটিত না থাকিতেন, তবে বর্হির্মুখ জীবদিগকে প্রকৃত মঙ্গলের কথা জানাইয়া ভগবতুন্মুখ করাইতে কেহ পারিত না। বর্হিমুখ জনগণ শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু তিনি কুশলতার সহিত তাহাদিগকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া পরম মঙ্গল বিধান করেন, উহাদের দ্বারা উপেক্ষিত এবং নির্য্যাতিত হইয়াও উহাদিগকে কৃপা করিতে ত্রুটী করেন না, ইহাই তাহার গুরুত্ব।

শ্রীগুরুদেব পূজা বা সম্মান পাওয়ার জন্য লালায়িত নহেন। তিনি ভুক্তি মুক্তি আদি না চাইলেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উহারা সর্বক্ষণ করজোড়ে অবস্থান করিয়া থাকে।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতয়া ভগবন্ যদি স্যাৎ।
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্তিঃ॥
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"
"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছেও তার হয় বিধাতা নির্মিত॥"

শ্রীগুরুদেব অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে সুদক্ষ। কেহ যদি শ্রীভগবৎ-সেবার বিন্দুমাত্র ও আনুকুল্য করেন তাঁহাকেও গুরুদেব বিশেষ সম্মান প্রদর্শন

করিয়া অজস্র আশীর্বাদ করেন এবং ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি অপরের অল্প গুণকে বহুমানন করিয়া থাকেন আর বহু দোষকে অল্প করিয়া দেখেন। কিন্তু বদ্ধজীবের স্বভাব ইহার বিপরীত। অল্প দোষকে উহারা বহু দোষ বলিয়া জ্ঞান করে; অপরের বহুগুণ বা যোগ্যতা থাকিলেও তাহা দর্শন না করিয়া মক্ষিকা-বৃত্তির ন্যায় তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে নিজের শত দোষ থাকিলেও সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। নিজেকে ভাল মানুষ বা ন্যায়পরায়ন বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব সর্বদা অমানী ও মানদ হইয়া ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন থাকেন এবং অপরকেও সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। এইজন্য গুরুদেবের ন্যায় এমন হিতাকাঙ্ক্ষী এ জগতে আর কেহ নাই। নরক গমনোন্মুখ জীবগণকেও গুরুদেব অযাচিতভাবে গোলকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টান্বিত। তিনি ঘৃণ্যকেই জগদ্বরেণ্য করিতে পারেন, অযোগ্যজনকে যোগ্যতা দান করিতে পারেন, সেবাবিমুখকে সেবোন্মুখ করিতে পারেন ইহাই তাঁহার গুরুত্ব।

ভগবৎপ্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল এ জগতে প্রকটিত থাকেন। কখনও গুরুদেবের আসন শূন্য থাকে না। রাজ্যের শাসক বা পালক না থাকিলে রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেইরূপ পরমার্থ রাজ্যের নিয়ামক শ্রীগুরুদেব প্রকট না থাকিলে ঘোর অধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেব নিত্যকাল এ জগতে বিরাজিত থাকেন। বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাজ্যের নিয়ামকরূপে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ প্রকটিত আছেন। তিনি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পর্যটন করিয়া হরিকথামৃত বিতরণ করিয়া সর্বজীবের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, তাঁহার শ্রীমুখবাণী যাহারা শ্রবণ করিয়াছেন, যাহারা তার মধুর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা তাঁর অসীম গুণরাশিতে আকৃষ্ট হইয়া বশীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর কীর্তিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের

মূর্ত্তবিগ্রহ,—ইহাই তাঁহার গুরুত্বের সম্যক্ নিদর্শন। তিনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগজ্জনকে উহাতে উদ্বুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প আছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী সভক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

২১শে অগ্রহায়ণ (১৩৮৬) ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭৯) শুক্রবার কৃষ্ণচতুর্থী গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিচত্বারিংশৎ (৪৩) তম বার্ষিকী তিরোভাব মহামহোৎসব। সমগ্র বিশ্বে তাঁহার এই তিরোভাব উৎসব হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ১২৮০ বঙ্গাব্দ মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃষ্ণসেবাময় গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ৭ম বৎসর বয়সে গৌরপার্ষদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হ'ন। ঠাকুরের নির্দ্দেশে পরমহংস শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে-শ্রীব্রজপত্তনে বসিয়া তিনি শতকোটীনাম যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলেন, "তুমি বিশ্বে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আমার নাম প্রচার কর। সকলকে কৃষ্ণ-ভজন শিক্ষা দাও। নিজে ভজন করে জীবন সার্থক কর, এবং জগজ্জীবকেও ভজন করাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক কর। ইহা জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ উপকার। এই দেখ তোমার সাহায্যের জন্য পার্ষদগণসহ আমি তোমার নিকটেই আছি; পরম উৎসাহে প্রচার কর, কোন ভয় করিও না। মহাপ্রভুর এই অভয়

বাণী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রবিধি মতে "ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস" আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পরিব্রাজক বেশে আসমুদ্র-হিমাচল-ভারতবর্ষ ও সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে শ্রীগৌরসুন্দরের বিমল প্রেমধন প্রচার করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ বৎসর বিপুল উদ্যমে প্রচারের ফলে সর্ব-ভারতে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে ৭২টি শুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং সর্বস্ব সমর্পণকারী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সন্তানগণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সহযোগীতায় সর্ব বিশ্বে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচার, সেবানুকুল্য সংগ্রহ ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ আদি সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু কেরল, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশবাসী সহস্র সহস্র নরনারীগণ এমনকি বহু পাশ্চাত্য দেশবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া পরম আনন্দলাভের অধিকারী হইয়াছেন, ভারতবর্ষে বেশধারী বৈষ্ণবের ও মঠ মন্দির আখড়ার অভাব নাই, শ্রীল প্রভুপাদ তথাকথিত বৈষ্ণবের দল বৃদ্ধি বা মঠ মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া প্রচার করেন নাই। তাহার ইচ্ছা শুদ্ধভক্তি প্রচারের দ্বারা যদি একজন আচারবান শুদ্ধভক্ত পাওয়া যায় তাহাতেই জগতের প্রকৃত মংগল হইবে। তাই তিনি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র মঠ মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া আচারবান্ প্রচারক ভক্তগণ দ্বারা ভক্তিশিক্ষা প্রচার করিতেন। তিনি বহু আচারবান শরণাগত. সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ত্যক্তাশ্রমী বৈষ্ণবদ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের কথা সর্ব বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। তিনি একটি লোকের বহির্মুখতা বিদূরিত করিবার জন্য শতশত গ্যালন রক্ত খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি মংগলপ্রার্থী জনগণকে সর্বদা সাধুসংগের আবেষ্টনীর মধ্যে মঠ মন্দিরে রাখিয়া প্রতিদিন হরিকীর্ত্তন হরিসেবায় নিযুক্ত রাখিতেন। শিষ্যকে শুধু দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, গৃহস্থ শিষ্যগণের জন্যও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে পাঠাইয়া হরিকথা

অনুশীলনের সুবিধা করিতেন। এই প্রকারে তিনি কত বিমুখ লোককে উন্মুখ করাইয়া হরিভজনে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবের প্রতি অমন্দোদয় দয়ার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম জীবের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যধর্ম বা আত্মধর্ম। এই বৈষ্ণবধর্ম সর্বধর্মের আদি প্রাচীন ধর্ম এবং ইহা শুধু মানুষের নিত্যধর্ম নহে। ইহা সর্ব প্রাণীরই নিত্যধর্ম। অতি প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভেই লোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের আরাধনা করছেন। তারপর নারদ, শিব, ব্যাস, শুকদেব, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ যমরাজ, জনক, বলি, পরীক্ষিৎ, ধ্রুব, অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি মুনি, ঋষি, দেবতা, দানব, নর প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত থাকিয়া ভগবানের ভজন করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্তও কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত জনগণ ঐকান্তিভাবে কৃষ্ণভজন করিতেছেন। ধর্ম-ধ্বজী বৈষ্ণব নামধারীগণের ব্যভিচার কার্যো ব্যবহার আদি-দুর্নীতিকর কার্যাদি দেখিয়া ধর্মতত্ত্বানভিজ্ঞ শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব ধর্মকে অত্যন্ত হীনচক্ষে দেখিত। ইহার জন্য শ্রীলপ্রভুপাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে কত পবিত্র, কত শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্য পরম করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ বিরুদ্ধ মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়া শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম নিজ জীবনে আচরণ পূর্বক অনুগত শিষ্যগণকে আচরণে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা বিশ্বে প্রচারপূর্বক উহা সংস্থাপন করাই শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই ষড়বেগজয়ী হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্রীলভক্তিরসামৃত সিন্ধুর শিক্ষা নিজ জীবনে পালন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে নিজেকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অপ্রকটের কয়েকদিন পূর্বে অনুগত শিষ্যবর্গকে আহ্বান করিয়া শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারের নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "আপনারা সকলে রূপ রঘুনাথের

কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করিবেন। শ্রীপ্রভুপাদের ভক্তিময় পবিত্র আদর্শ চরিত্রের-স্পর্শ যাহার জীবনে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও হইয়াছে, তিনি সত্য সত্য ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ বজ্র হইতেও যেমন কঠোর স্বভাব ছিলেন, সেইরূপ কুসুম হইতে কোমল স্বভাব ছিলেন। তাহার বিপুল প্রচারের ফলে আজ বিশ্বে মহাপ্রভুর আচরিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত্ব হইয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বের কোনে কোনে লক্ষ লক্ষ লোক এই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর দিব্য ভবিষ্যৎবাণী আজ শ্রীলপ্রভুপাদের প্রচারের ফলে সর্বলোক লোচনে সত্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই এখন মহাপ্রভু সর্বদেশে সর্বলোক কর্তৃক কীর্ত্তিত ও পূজিত হইতেছেন।

গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীপ্রভুপাদ কলিযুগ পাবমাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যপরিকর, তাঁহার শুভেচ্ছায় তাঁহারই মনোভীষ্ট প্রচারের জন্য শ্রীলপ্রভুপাদ এই ভৌমজগতে উৎকল প্রদেশে শ্রীপুরুষোত্তমধামে ১২৮০ বঙ্গাব্দে গৌরপার্ষদ শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিকীর্ত্তন মুখরিত ভজনগৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনপূর্ব্বক যতিবেশে আসমুদ্র হিমাচলে—সমগ্র ভারতে ও বিশ্বে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম বিপুলভাবে প্রচার করিয়া সর্বহৃদয়ে এক মহা আনন্দ প্রাপ্তির সন্ধান প্রদান করিয়াছিলেন।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে শ্রীপ্রভুপাদের মহাপুরুষের বত্রিশটি (৩২) লক্ষণই বর্ত্তমান ছিল।

> পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্ম সপ্তরক্ত ষড়ুন্নতঃ।
> ত্রিহ্রস্ব পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণো মহান্।

বাল্যকাল হইতে তিনি বৈষ্ণবোচিত স্বভাবে বা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। নিম্নলিখিত গুণসমূহ তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম, অনিহ, স্থির বিজিত ষড়গুণ॥
মিতভূক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

শ্রীপ্রভুপাদকে দর্শন করিলেই হৃদয়ে পরমানন্দের সঞ্চার হইত। শ্রীল নরোত্তম বৈষ্ণবের মহিমা বিষয়ে গাইয়াছেন।

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

কোন কোন ভক্তিবিরোধী নাস্তিক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অসাক্ষাতে নানাপ্রকার সমালোচনা করিলেও যখন তাঁহার সম্মুখীন হইত, তখন তাহাদের মস্তক মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে নত হইয়া পড়িত, এমনকি পরিশেষেও অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইত, এইজন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৯৩৬ খ্রীঃ ১লা আগষ্ট অপরাহ্নকালে কতিপয় সেবকসহ শ্রীল নবদ্বীপ ঘাট হইতে নৌকা যোগে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভক্তিবিজয় ভবনের ঘাটে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই বৎসর বন্যা হওয়ায় ঐ সময় নৌকা এসেছিল, ঐ সময়—শ্রীযোগপীঠ—শ্রীবাস অংগন—শ্রীঅদ্বৈতভবন—শ্রীমুরারীগুপ্তের

পাট ও শ্রীচৈতন্যমঠের মঠবাসী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ভক্তগণ, ধামবাসীগৃহস্থ ভক্তগণ ও সমাগত শত শত যাত্রীগণ—"জয় শ্রীল প্রভুপাদ, জয় শ্রীল প্রভুপাদ" ধ্বনী, হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনি করিতে করিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন। সকলে তাঁহাকে দর্শনলাভ করিয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক তাঁহার শ্রীচরণে ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের প্রতি যে শুভ দৃষ্টি বর্ষণ করিলেন, তাহাতে তৃষ্ণার্ত-ভক্ত চাতকগণ অসীম আনন্দে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ দিনই আমি সর্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। তখন আমি তাঁহাকে অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলাম, এই মহাপুরুষটি কে? ইনি কি কোন দেবতা না—বৈকুণ্ঠের ভগবৎ পার্ষদ। এমত সুন্দর মানুষত আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল হইতে যেন একটা দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার গৌরবর্ণ কান্তি, আজানুলম্বিত ভূজ, স্নেহপূর্ণ অতি সুকোমল শ্রীচরণ, মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত বদন দর্শন লাভ করিয়া আমার হৃদয়ে মহাআনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন পূর্বক নিজ ভজন গৃহে শ্রীভক্তিবিজয় ভবনে গমন করিয়া ধামবাসী বৈষ্ণবগণের নিকটে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৪ঠা আগষ্ট (১৯৩৬) শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু কৃপাপূর্বক নবাগত মঠবাসী আমাদের কয়েকজনকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে নিয়ে যান। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিছু সময় হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সময়ে মাত্র তিন দিন শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান পূর্বক সকালে বিকালে বৈষ্ণবগণের নিকট আবিষ্ট চিত্তে সাধনের নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ

হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি হরিকথা কীর্ত্তনে এত তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে—নিজ আহার ও বিশ্রামের কথাও বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিয়া যে কি আনন্দ অনুভব করিয়া ছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া গত ১১ই আগষ্ট (১৯৩৬) শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত পালনার্থে বহু ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমথুরাধামে শুভ যাত্রা করেন। প্রায় একমাস যাবৎ শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্থানে দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন ভক্তসহ ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) নিউ দিল্লী গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করিলেন, পরদিন সেখান হইতে রওনা হইয়া ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে ছয় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৬) ৭ই কার্ত্তিক (১৩৪৩) ঊর্জ্জাব্রত পালনার্থে কয়েকজন বৈষ্ণবসহ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শুভাগমন করিলেন। ঐদিন ইউরোপ মহাদেশে প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা নির্দ্দেশে লণ্ডনে শুভযাত্রা করিলেন।

একদিন ঊর্জ্জাব্রতকালে পুরীতে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হরিকথা প্রসঙ্গে ভক্তগণকে বলিলেন আমরা এখন গোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীচটক পর্ব্বতে বাস করিতেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় ব্রজবাসীগণ দ্বাপর যুগে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত গোবর্দ্ধনের পূজা উদ্যাপন করিয়াছিলেন। পরম নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতবর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনের শ্রীঅন্নকূট মহা-মহোৎসব বিরাট আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং গোবর্দ্ধনাভিন্ন এই চটক পর্বতেও এই সময় শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব হওয়া উচিত।

শ্রীল গুরুদেবের এই শুভেচ্ছা অবগত হইয়া গুরুসেবকগণ পরম উৎসাহে ঐ অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তড়িৎবার্ত্তা যোগে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে, কলিকাতায়, শ্রীধাম মায়াপুরে এবং অন্যান্য স্থানে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে জানান হইল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ নানাবিধ সেবোপকরণসহ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুসরণে বৈষ্ণবরাজ শ্রীল প্রভুপাদ এই অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সমাগত শ্রদ্ধালু বৈষ্ণব গৃহিণী-গণ বিপুল উৎসাহে চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্বিধ বিচিত্র ভোগ রচনা করিয়াছিলেন, পাঠ বক্তৃতা ও মহাসঙ্কীর্ত্তন মুখে শ্রীল প্রভুপাদের পৌরহিত্যে (নির্দ্দেশে) শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগ নিবেদন হইয়াছিল। ভোগারতি সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও ধামবাসী সর্বসাধারণকে শ্রীঅন্নকূটের চতুর্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় অতি অল্প সময়ের উদ্‌যোগে এইরূপ বিরাট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া পূর্বের সেই অন্নকূট মহোৎসবের কথা সকলের স্মরণ হইল।

ঊর্জ্জাব্রত সমাপ্তির পরে শ্রীল প্রভুপাদ ৮ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থলীলা অভিনয় করায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রিয় ভক্তগণকে আনাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থ সংবাদ অবগত হইয়া বিভিন্ন স্থানের প্রিয় শিষ্যগণ ও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ ক্রমশঃ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তিম চরম মনোঽভীষ্টের কথা উপদেশ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর এই বিশেষ নির্দ্দেশ প্রচার করিতে শিষ্যগণকে শক্তি সঞ্চার করিলেন।

১৪ই ডিসেম্বর (১৯৩৬) শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কতিপয় মঠবাসী সেবক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এ পতিতাধমও ছিল। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভজন কুটীরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। তখন তিনি কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন—মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তোমরা মঠে আসিয়াছ—তোমরা তাঁহার চরণে ঐকান্তিক শরণাগত হয়ে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবে। কৃষ্ণসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।

মনুষ্য শরীরই কৃষ্ণ ভজনের অনুকূল, বিষয় ভোগাদি পশুপক্ষী জন্মেও পাওয়া যায়—কিন্তু কৃষ্ণভজন মনুষ্য জন্ম ছাড়া অন্য জন্মে হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমরা—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি॥

তাই কৃষ্ণভজন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া জানিবে।

ঐ দিন (১৪ই ডিসেম্বর) রাত্রি ৯ঘটিকায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও আমার পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে রওনা হইবার নির্দ্দেশ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন পরম পূজনীয় শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আবেদনে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিন অপরাহ্নেই আমাদের দুইজনকে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত ॥

করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের সে দিনের সেই কারুণ্যময় মূর্ত্তিখানা এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে যেন ভাসিতেছে। তাঁহার বিস্তৃত নয়ন অতি স্নেহপূর্ণ, তাঁহার মুখমণ্ডল মৃদুমন্দ হাস্যপূর্ণ, তাঁহার বদন কমল হৃদকর্ণ রসায়ন—হরি কথামৃতে পরিপূর্ণ, তাঁহার আজানুলম্বিত দক্ষিণ হস্তখানি শ্রীনাম মালিকায় সুশোভিত। তাঁহার নবনীতসম সুকোমল শ্রীচরণযুগল অতি সুন্দর তাঁহার গৌরবর্ণ শ্রী অঙ্গখানি সর্বচিত্ত আকর্ষক, তাঁহার এই শ্রীরূপমাধুরী হৃদয়কে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে।

সেইদিনই (১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৬) রাত্রে Danapur Express-এ শ্রীরাধা কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও আমি পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে রওনা হইয়াছিলাম। ১৫ দিন পরে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী (১৯৩৭ খ্রীঃ) উষাকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় ভজনগৃহে বৈষ্ণবগণ-কীর্ত্তিত হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্ত লীলায় (গোলোকের নিত্যলীলায়) প্রবেশ করিলেন। ঐ সংবাদ তড়িৎ বার্তাযোগে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে এমনকি শ্রদ্ধালু সজ্জনগণও আচণ্ডাল সর্বসাধারণ জনগণ বিপুল শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্বের কোণে কোণে—বিভিন্ন নগরে নগরে বিশ্ববাসীর পরম গৌরবের পাত্র বিশ্বের মুকুটমণি শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে শোকসভার আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের বিমল প্রেমধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক গুণ মহিমার কথা শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার বিরহ তিথিতে (১০ই পৌষ ১৩৮৭) ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৮০) তাঁহার কোটীচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আমরা প্রার্থনা করিতেছি—তিনি যেন

আমাদিগকে তাঁহার অশোক, অভয়, অমৃত আঁধার শ্রীচরণে নিত্যকাল আশ্রয় প্রদানপূর্বক শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের নিত্যকাল আশ্রয় প্রদান পূর্বক শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের প্রীতিপূর্ণ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া চির কৃতার্থ করেন।

গুরুদেব,

কৃপা বিন্দু দিয়া, কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজমানে স্পৃহাহীন॥

* * *

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

* * *

কৃপা করি রাখ মোরে তব শ্রীচরণে।
কৃষ্ণ কার্য্য সেবা দিয়ে পাল সর্বক্ষণে॥

শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগ

পিতৃ পরিচয়

শ্রীহিরণ্য আর, গোবর্দ্ধন দুই,
সপ্তগ্রাম অধিকারী।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, অর্থ-বিতরিতে,
অতীব গৌরবকারী ॥
বার লক্ষ মুদ্রা, রাজার ভাণ্ডারে,
প্রতিবর্ষে কর দেয় ।
বিশ লক্ষ কর, মুলুকে উঠায়,
অষ্টলক্ষ লাভ পায় ॥
সুখের সংসারে, ভোগের মাঝারে,
পরমার্থ ভুলে' তারা ।
আহার নিদ্রায় দিবশ গোয়ায়,
বিষয় বিষ্ঠার ক্রীড়া ॥

বাল্যে রঘুনাথের সাধুসঙ্গ লাভ

অগ্রজ হিরণ্য, নিঃসন্তানে দুঃখী,
গোবর্দ্ধন পুত্রবান্ ।
পুত্র রঘুনাথ, ভক্তে প্রীত অতি,
অতিশয় গুণবান ॥
বলরামাচার্য, কৃষ্ণভক্তবর্য,
হরিদাস কৃপাপাত্র ।
আপনার ঘরে, অধ্যাপনা করে,
রঘুনাথ তার ছাত্র ॥
এককালে তথা আইলা ঠাকুর,
নামাচার্য হরিদাস ।
ভক্তগোষ্ঠী লয়ে করে সংকীর্ত্তন,
রঘুনাথ রহে পাশ ॥

হরিদাস তাঁরে, স্নেহ কৈল বড়,
রঘুনাথ সেবা কৈল।
গৌর নিত্যানন্দে, আসক্তি জন্মিল,
দর্শনে ব্যাকুল হইল ॥

শ্রীরঘুনাথের খেদ

ভক্ত মুখে শুনি, গৌর নামধ্বনি,
আকুল হৈল পরাণ।
কায় বাক্য মন, প্রাণ আত্মাধন,
গৌরপদে কৈল দান ॥
দর্শন লালসে চঞ্চল মানসে,
অনুরাগানলে জ্বলে ॥
কবে গৌর পাব হৃদয়ে ধরিব,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
'গৌর দয়াময়, হইয়া সদয়,
এ মহী মণ্ডলে আসি।
অযাচক জনে পরম যতনে,
বিতরিল প্রেমরাশি ॥
পতিত যে যত, কৃপা করে তত,
গুণদোষ নাহি বাছে।
এমন দয়ালু কভু না দেখিলু
পশুরেও প্রেম যাচে ॥
হেন অবতারে, মোহেন পামরে,
না পাইল সঙ্গসুখ।

আপন করমে, জ্বলিত মরমে,
কি কহিব মম দুঃখ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়

রঘুনাথ মন যবে এমত হইল,
শ্রীগুরু আশ্রয় লাগি চিন্তা উপজিল।
অদ্বৈত-আচার্য-শিষ্য শ্রীযদুনন্দনে,
বাসুদেব দত্তপ্রিয় ভক্ত মহাজনে,
পিতৃপদে নিবেদিয়া নিজ অভিলাষ,
গুরুপদে নিয়োজিল, লভিল উল্লাস ॥

গৃহত্যাগে চেষ্টা

জগৎ মোহিত যেই বিষয় আনন্দে,
তাহে সদা বিষ লাগে, রঘুনাথ কাঁদে।
বিষয় ছাড়িতে সদা মন তার চায়।
কেমনে ছাড়িব তাহা, না দেখে উপায়।
বিপুল ঐশ্বর্য্য আর, সুখের সংসার।
সব জানে রঘুনাথ অকিঞ্চিৎকর ॥
বিপ্রলম্ভ শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর।
নীলাচলে আছে 'শুনি' ব্যাকুল অন্তর ॥
অস্থির হইয়া চলে, প্রভুর উদ্দেশে।
গৃহ ছাড়ি ধায় বেগে উড়িয়ার দেশে ॥
রঘুনাথে না দেখিয়া, সকলে বিহ্বল।
"কোথা রঘুনাথ গেল'—উঠে কোলাহল ॥

চতুর্দিক ধায় লোক রঘুনাথ লাগি'।
অবশ্য আনিব তারে কোথা যাবে ভাগি॥
এমত বলিয়া লোক চারিদিকে ধায়।
বহুকষ্টে রঘুনাথে ধরিয়া আনয়॥
তাকে পেয়ে পিতামাতা বহু বুঝাইল।
স্নেহ করি সদা তারে নিকটে রাখিল॥
দিবা রাত্রি পঞ্চজন পাহারায় থাকে।
চারিটি ভৃত্যকে তার সেবাতেই রাখে॥
দুইটি ব্রাহ্মণে রাখে সান্ত্বনা করিতে।
যাতে গৃহে মন মজে, না পারে পালাতে॥
তেঁহ তথা রহি' অনাসক্ত নিরন্তর।
ভক্ত সংগ না পাইয়া দুঃখিত অন্তর॥
মাতা পিতা চিন্তে তাঁর দেখি ঔদাসীন্য।
ভাবি অধিকারী তেঁহ নাহি কেহ অন্য।
অতএব বিষয়েতে ফিরে যাতে মন।
চিন্তিল উপায় এক পরম মোহন॥
"সুন্দর যুবতী সহ বিবাহ করাবো।
পীরিতি করায়ে তাহে বিষয়ে ভুলাবো॥

তথা হি গীত :—

কামিনীর রূপে কেবা না হয় মোহিত ;
দৈত্য, দেব, নর-দেবরাজ ইন্দ্র ;
ভোগী যোগী, জ্ঞানী, ব্রহ্মা, বুধ, চন্দ্র ,
ঈশ্বর সৃজিত সেই নারী মুখচন্দ্র ;

ভক্ত বিনা আর সবে দেখিয়া মোহিত।
কামিনীর রূপে কেবা না হয় মোহিত ॥

রূপে, মুগ্ধ হয়ে, মরয়ে পতঙ্গ,
স্পর্শ সুখ আশে আবদ্ধ মাতংগ
রস লোভে পদ্মে ছাড়ে প্রাণ ভৃঙ্গ
গন্ধে মীন, শব্দে মৃগ বশীভূত।
বিষয় সমূহে সকলি মোহিত।
কামিনীর রূপে কেবা না মোহিত ॥

এ পঞ্চ বিষয় কমিনীতে রয়,
বিষয়ী দুর্জন তাই মুগ্ধ হয়,
নারী বশ হ'লে পরমার্থ ক্ষয়,
কৃষ্ণদাস শুধু বিষয় বিজিত।
কামিনীর রূপে কেবা না মোহিত ॥

শ্রীরঘুনাথের বিবাহ—

আনিয়া অপ্সরা সমা রূপবতী কন্যা।
বিভা দিলা রঘুনাথে নানা গুণে ধন্যা ॥
বহুপ্রীতি করি' তারে সেবে সেই সতী।
বধুর করম দেখি সবে তুষ্ট অতি ॥
পিতা এবে মনে ভাবে, পুত্র স্থির হবে।
পত্নী-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিষয়ে মজিবে ॥
ক্ষুধানলে সদা দগ্ধ যাহার উদর।
তৃপ্তি নাহি দেয় তারে বসন সুন্দর ॥
গৌর পদ সেবা লাভে চিত্ত যার ধায়।

নারীসংগ সুখে তাহে স্থান নাহি পায় ॥
স্ত্রী চিন্তা না করে কভু, ফিরিয়া না চায়।
কিরূপে লাভবে গৌর সদা চিন্তা হয় ॥

শান্তিপুরে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ—

সন্ন্যাসান্তে মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইল।
শুনি রঘুনাথ আসি প্রভুরে মিলিল ॥
ভূমিতে পাড়য়া তেহো চরণ বন্দিল।
অদ্বৈত প্রসাদে গৌর উচ্ছিষ্ট পাইল ॥
পাঁচ সাত দিন রাহ প্রভু সেবা কৈল।
প্রেমেতে পাগল হয়ে গৃহেতে ফিরিল ॥
গৃহে মন নাহ লাগে সদা উদাসীন।
প্রভু পাশে রৈতে মন কৈলা সমীচীন ॥
গৃহ ছাড় বার বার পলাইয়া যায়।
পথ হতে ধরি আনে রাখে পাহারায় ॥
পুনঃ যবে মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইল।
শুনি রঘুনাথ মন ব্যাকুল হইল ॥
দৈন্য নিবেদল ধরি পিতার চরণ।
প্রভুরে মিলাও নৈলে না রহে পরাণ ॥
শুনি পাঠাইল তারে রক্ষীগণ সাথ।
সাতদিন প্রভু পাশে রহে রঘুনাথ ॥
আপনার মন কথা প্রভুরে জানায়।
সর্বদা প্রভুর সঙ্গে রহিবারে চায় ॥
প্রভু তারে লক্ষ করি করে উপদেশ।
সবার মঙ্গল হয় শুন সে আদেশ ॥

মহাপ্রভুর প্রথম উপদেশ ঃ—

চঞ্চলতা না করিহ ঘরে ফিরে যাও।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়, মিতভোগী হও॥
বাহ্যে লোকব্যবহার, মনে নিষ্ঠা রাখ।
অতি শীঘ্র কৃষ্ণ কৃপা করিবে প্রত্যক্ষ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ যবে বিষয় ছাড়াবে।
সেকালে উপায় জেনো তোমারে স্ফুরাবে॥
প্রভু উপদেশ লভি' গৃহেতে আইল।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জে অনাসক্ত হৈল॥

পুনরায় গৃহত্যাগের চেষ্টা—

রঘুনাথ কার্য দেখি সকলে প্রসন্ন।
প্রহরী বেষ্টন আদি কিছু হৈল খিন্ন॥
ব্রজ হৈতে নীলাচলে প্রভু আগমন।
শুনি' মিলিবারে চাহে রঘুনাথ মন॥
বৈষয়িক গণ্ডগোল সুযোগ না হৈল।
এই মত একবর্ষ বৃথা কেটে গেল॥
অকস্মাৎ রঘুনাথ রাত্রে পলাইল।
চেষ্টা করি গোবর্দ্ধন ধরিয়া আনিল॥
বার বার ভাগে তেহো পুনঃ ধরি আনে।
তার মাতা কহে তাকে বাঁধহ যতনে॥
শুনি গোবর্দ্ধন কহে, তুমি বুদ্ধি হীনা।
দড়ির বন্ধনে—তাকে রাখে কোন্ জনা?
জগৎ বিমুগ্ধ যেই কামিনী কাঞ্চনে।
তাহা রঘুনাথে নারে করিতে মোহনে॥

প্রভু আকর্ষণ যবে হ'য়েছে ইহারে।
নিশ্চয় জানিবে কেহ রাখিতে না পারে ॥

শ্রীশ্রীলনিত্যানন্দ প্রভুর সেবালাভ—

কতদিন পরে যবে নিত্যানন্দ রায়।
পানিহাটী গ্রামে কৈল মংগল বিজয় ॥
পিতৃ আজ্ঞা নিয়া গেল তাঁহার চরণে।
গণসহ নিত্যানন্দ সেবিল যতনে ॥
দধি চিড়া মহোৎসবে সবে তুষ্ট হৈল।
নিত্যানন্দ রঘুনাথে অতি কৃপা কৈল ॥

তথা হি গীত :—

নিতাই যারে কৃপা করে, বিঘ্ন সব ভাগে দূরে,
গৌর সেবা মিলে অনায়াসে।
অনুকূল সব হয়, ভজনাগ্রহ বাড়য়,
প্রেমামৃত রসে নিত্য ভাসে ॥
অতএব বুদ্ধিমান্, করি বহু সুযতন,
সেবে গুরু-নিত্যানন্দ পদ।
দৃঢ় করি হৃদে ধরে, নাহি ছাড়ে কভু তারে,
সুদুর্ল্লভ সেই সে সম্পদ ॥

শ্রীল রঘুনাথের গৃহত্যাগ—

নিত্যানন্দ পদধূলি শিরেতে লইয়া।
রঘুনাথ গৃহে গেল আনন্দিত হইয়া ॥
সেই হৈতে বহির্গৃহে করয়ে শয়ন।
অতি সতর্কিত সদা রহে রক্ষীগণ ॥
একদিন রাত্রিশেষে শ্রীযদুনন্দন।

রঘুনাথ গুরু তথা কৈল আগমন ॥
তেহ কহে মোর শিষ্য ছাড়িল অর্চন।
পূজা করিবারে আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
তাঁকে সাধি তুষ্ট করি পূজাতে লাগাও।
এই যে কারণে তুমি শীঘ্র চলি যাও ॥
এতশুনি রঘুনাথ তথায় চলিল।
সাধিতে সেবকে ছলে গুরু আজ্ঞা নিল ॥
সেইকালে রক্ষীগণ তন্দ্রায় আছিল।
পথ ছাড়ি রঘুনাথ উপপথে গেল ॥
প্রভুপদ চিন্তা করি'-নীলাচলে ধায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে ছুটিয়া পলায় ॥
দিবারাত্র চলি তেঁহো দ্বাদশ দিবসে।
উৎকণ্ঠা মনে আইল প্রভুপদ পাশে ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম লাভ—

প্রভুর চরণ, করি দরশন,
প্রণিপাত করি দূরে।
দেখি ভক্তগণ, আনন্দিত হন,
জানায় মহাপ্রভুরে ॥
রঘুনাথ গিয়া, চরণ ধরিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে।
বিষয় বন্ধন; হইল ছেদন
তোমার করুণা বলে ॥
কৃপা করি নাথ, কর আত্মসাৎ,
রাখহ চরণ তলে।

সেবা দিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে,
রহি যেন নীলাচলে ॥
দেহ মলিনতা, দেখিয়া ক্ষীণতা,
মহাপ্রভু কহে ডাকি'—
"এই রঘুনাথ, দিলু তব হাতে ;
পুত্রবৎ পাল রাখি ॥
আজ হতে সবে, ইহারে জানিবে,
'স্বরূপের রঘু বলে'।
এত কহি তারে, দিল স্বরূপেরে,
স্বরূপ লইল কোলে ॥
বৈষ্ণব সকল তারে স্নেহ কৈল
জগন্নাথ দেখা হ'ল।
প্রভুর প্রসাদ, পরম সম্পদ
গোবিন্দ আনিয়া দিল ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় উপদেশ :—

আর একদিনে, প্রভুর চরণে,
স্বরূপে পুছিতে বলে।
বিষয় ছাড়ায়ে, কি কাজ লাগিয়ে,
আনিয়াছ নীলাচলে ॥
কিবা কৃত্য মোর, কিবা সাধ্য আর,
মোর প্রতি কি আদেশ।
প্রভু আজ্ঞা যেই, পালিব তাহাই,
পুছ তাহার নির্দেশ ॥"

প্রভু শুনি তারে, বলেন আদরে,
স্বরূপ তোমার গুরু।
তাঁহার সকাশে জানিবে বিশেষ,
তেহ বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
তোমার ইচ্ছায় বলিতে জুয়ায়
দুই চারি হিত কথা।
কভু না শুনিবে, কভু না বলিবে
যোষিৎ সঙ্গ গ্রাম্য কথা ॥
উত্তম আহারে জিহ্বা বেগ বাড়ে,
উপস্থের দাস হয়।
উপস্থের বেগে, সর্বানর্থ জাগে,
ত্যজিবে যতনে তায় ॥
উত্তম বসনে, শয্যা উপাধানে,
বিলাসিতা শুধু বাড়ে।
ছাড়িয়া গুবেশ, নিলে ভক্ত বেশ,
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে ॥
ত্যজ অভিমান, কর মান দান,
সদা লহ কৃষ্ণনাম।
যুগল চরণ মানসে সেবন,
ক'র বসি' ব্রজধাম ॥
এত বলি তারে, আলিঙ্গন করে,
পুনঃ স্বরূপে অর্পিল।
রহি তার সংগে, রঘুনাথ রঙ্গে,
অন্তরঙ্গ সেবা কৈল ॥

শরণাগতি

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

অশরণাগতের প্রার্থনা ভগবানের কর্ণগোচর হয় না।

ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমির অধিকাংশ অধিবাসীই কম বা বেশী পরিমাণে বিভিন্ন রূপে ভগবদ্ উপাসনা করিয়া থাকে; কিন্তু ফল নির্ণয় করিয়া দেখিলে দেখা যায়, অধিকাংশ উপাসক সুষ্ঠু ফল লাভ করিতে পারে না, অতি অল্পসংখ্যক জনই সম্যক ফল লাভ করিয়া থাকে। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিলে কোন কার্যেই সুফল হয় না। উপাসনা বিষয়েই সেইরূপ সু-উপায় গ্রহণ না করিলে সুফল লাভ করা যায় না। অনেকে বহুকাল উপাসনা করিয়াও যখন সুফল লাভ করিতে পারে না, অথচ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে আগ্রহ বিশিষ্টও নহে, তখন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে—"এতকাল যাবৎ সাধন করিলাম, ভগবানকে কত ডাকিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। 'ভগবান' বলিয়া কি কেহ আছেন? থাকিলেও তিনি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিতেন মনে হয়, শাস্ত্র মহাজনগণ আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া একটি মিথ্যা সাধনের উপদেশ করিয়াছেন; বস্তুতঃ ভগবান বলিয়া কেহই নাই।" সমচিত্ত বৃত্তি বিশিষ্ট অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের সংগে এই প্রকার আলাপ আলোচনা করিতে করিতে তারা চিরতরে সাধন পরিত্যাগ করে এবং মহা-নাস্তিক হইয়া পড়ে। ঐসমস্ত অশরণাগত অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা ভগবানের কর্ণে পৌঁছায় না, অর্থাৎ উহাদের অভিলাষ অনুরূপ ফল লাভ হয় না।

ভক্তির দ্বারাই ভগবান বশীভূত

শাস্ত্র মহাজনগণ সূক্ষ্মবিচার করিয়া ভক্তিকেই ভগবানের সান্নিধ্যলাভ ও তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র সহজ উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। ইহা ছাড়া আর দুই প্রকার ভক্তির অঙ্গ আছে, উহার নাম গুরুসেবা ও শরণাগতি। এই শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ "শরণাগতিং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ।" শরণাগতি বিনা ভগবৎ সম্বন্ধিত্বে সিদ্ধ হয় না। ইহাই ইহার "অপূর্ব্বত্ব"।

শরণাগত ভক্ত ভগবানকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্তা বলিয়া জানেন এবং ভগবানও তদীয় শরণাগত ভক্তের 'যোগ' ও 'ক্ষেম' বহন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভক্তকে অপ্রাপ্য বস্তু পাওয়াইয়া দেন এবং প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

(গী ৯।২২)

কিন্তু অশরণাগত কর্মী জ্ঞানীদিগের প্রার্থনা বা স্তব-স্তুতি পূজা ভগবানের অপ্রীতিকরই হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।"

তাই উহারা সাধনা করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

সংসার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া উহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া মর্ত্ত্যগণ অগতির গতি ভগবানের শরণাগত হয়। তখন সেই শরণাগত-জন পবিত্র নির্ভয়ে বিচারপূর্বক পরানন্দের অধিকারী হইয়া থাকে।

"মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্
সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ
শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥" (ভাঃ ১০।৩।২৭)

"হে ভগবান্! মর্ত্ত্যপুরুষ মৃত্যুরূপ কালসর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিল লোকে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় হয় নাই, পরন্তু অন্য যদৃচ্ছাক্রমে ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া, সুস্থচিত্তে শরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং মৃত্যু তাঁহার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে।

ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতি হওয়ার জন্য যদি বর্ণাশ্রমধর্ম, তথাকথিত কর্ত্তব্য বা ধর্ম পালনের ত্রুটি হয়, কিংবা উহা অকারণে পাপ হয়, তাহাতে ভয়ের কিছু নাই। এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় অভয় প্রদান করিয়াছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"
(গী ১৮।৬৬)

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাতে তুমি শোক করিও না।"

ষড়্‌বিধ শরণাগতি

শরণাগতি 'ছয় প্রকার'—(১) ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ, (২) ভক্তির প্রাতিকূল্য বর্জন, (৩) শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করা, (৪) শ্রীকৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া জানা, (৫) শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে আত্মনিবেদন ও (৬) কার্পণ্য বা দৈন্য।

এই ষড়বিধ শরণাগতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পালকত্বে বরণই উহার "অংগী", অপর পাঁচটী অংগ পরিকররূপে উহাতে অনুস্যূত থাকে।

১। ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ—

ভগবানের কৃপা লাভ করিতে যাহার ঐকান্তিক বাসনা তাহাকে ভক্তির অনুকূল সূচক কার্য্য নিষ্ঠার সহিত যাজন করিতে হইতে হইবে। চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়-কার্য হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নিরন্তর ভগবৎ সেবায় লাগাইতে হইবে। চক্ষু দ্বারা ভগবৎ শ্রীবিগ্রহ, ধাম ও ভক্তের দর্শন করিতে হইবে। কর্ণ দ্বারা ভগবৎ কথা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ভগবৎ নৈবেদ্য ও তুলসীর ঘ্রাণ-গ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা একমাত্র ভগবৎ প্রসাদ সেবন, ত্বকের দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের শ্রীঅংগের পরিচর্য্যা করিতে হইবে।

এই প্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎ সেবায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত করিতে পারিলে আনুসংগিকক্রমে ইন্দ্রিয়গণের নায়ক মনও ভগবৎ সেবায় অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। তখন আর কোন ইতর চিন্তায় রত হইতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বদা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত না রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে শত চেষ্টা করিয়াও মনকে ভগবদ্ ধ্যানে নিযুক্ত করা যায় না ; অলক্ষিতভাবে মন পুনঃ পুনঃ বিষয় চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়ে। ভক্তগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠান যাজন করেন, মংগলকামী সাধকগণ সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকেই ভক্তির অনুকূল-সূচক জানিয়া উহা সম্পাদন করেন। তাই উঁহারা অনায়াসে ভগবদ্-ভক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারেন।

২। ভক্তি-প্রাতিকূল্য বর্জন ঃ—

রোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিয়মিত ঔষধ সেবন করিয়াও কুপথ্য গ্রহণ করিলে যেমন আরোগ্যলাভ করিতে পারে না ; সেইরূপ সাধক ভক্তির অনুকূল শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করিয়াও যদি অসৎসংগরূপ প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ না করে, তবে সাধন করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিবে না। এইজন্য সাধকগণের পক্ষে অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট জনও ভগবদ্ বিদ্বেষীর সংগ অতি সুকৌশলে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। অপবিত্র স্থানে বাস, অসৎকাম রতি, ভক্তিবিরোধী বা গ্রাম্যকথাপূর্ণ নাটক-নভেল-গ্রন্থপাঠ, অভক্তিকর ভাষণ শ্রবণ অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ

করিতে হইবে ; নতুবা সাধনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-আদি স্বজন বান্ধবগণ যদি ভক্তির বিরোধমূলক আচরণ করে, তবে প্রথমে উহাদিগকে সতর্ক করিয়া মানসে তাহাদের সংগত্যাগ করিতে হইবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও ভগবদ্ বিরোধীভাব ত্যাগ না করে, তবে দৃঢ়তার সহিত তাদের সংগ চিরতরে বর্জন করিতে হইবে। ইহাতে দ্বিধাবোধ করিলে বিষয়ান্ধ কূপ হইতে কোনমতেই উদ্ধার লাভ করা যাইবে না। ভগবদ্ বিরোধীজনের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই ; কারণ ঐ দান গ্রহণ করিলে উহার অসদ্ বৃত্তিসমূহ সংক্রামিত হইয়া সাধককে নিরয়গামী করায়, এইরূপে ভক্তির যাবতীয় বিরোধী কর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত ব্যক্তি ভক্ত্যংগসমূহ যাজন করিয়া ভগবানের অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে, ভক্তিপ্রাতিকূল্যবর্জনে সাধকের দৃঢ়তা :—

"যাহা কিছু ভক্তি প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥"

(শরণাগতি—গীতি—২৬)

শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করা :—

শরণাগত ভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন। অশরণাগত জীব ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইয়া বিবিধ ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। কিন্তু শরণাগত ভক্ত ভগবানকে রক্ষাকর্ত্তা জানায়, নিজে দুঃখ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া ভগবৎ-সেবাই করিতে থাকেন। ভক্তবৎসল ভগবান শরণাগত ভক্তকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্ম তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, ভক্তের বিশ্বাস—

"তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এভব-সংসারে।"

—(শরণাগতি—গীতি—২১)

৪। শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পালনকর্তা বলিয়া জানা ঃ—

শরণাগতজন নিজের কর্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকেই একমাত্র পালক বলিয়া বরণ করেন। যতদিন কর্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে, ততদিন জীবনযাত্রা-নির্বাহে ও কুটুম্বগণের ভরণপোষণ চিন্তায় মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। একটী বিপদকে তাড়াইতে গিয়া আর দশটী সমস্যার সৃষ্টি হয়। এইরূপে সে যখন নিরুপায় হইয়া পড়ে, তখন অনাথের নাথ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইতে বাধ্য হয়, তখন সে তাঁহার সেবায় নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে ; নিজেকে নিত্যপাল্য ও সেবক জানিয়া প্রভুকে নিত্য পালক-বোধে নিরন্তর সেবা করিতে থাকে, তখন উল্লাসের সহিত অনুভব করে,—

"তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু ! বড় সুখ মানি ॥

* * *

তুমিত' রক্ষক আর পালক আমার
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥
নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥"

—(শরণাগতি—গীতি—১৮,২০)

৫। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মনিবেদন ঃ—

বদ্ধজীবের কর্তৃত্বাভিমান প্রবল থাকায় তাহাকে বিবিধ সংসার-দুঃখভোগ করিতে হয়। উহা হৈতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হইতে পারে না, তখন নিরুপায় হইয়া পরম করুণানিদান শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া

পড়ে। সেইসময় সে স্বীয় জীবনের দুষ্কর্মের কথা স্মরণ পূর্বক অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিতে থাকে এবং ভগবচ্চরণে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিতে করিতে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করে। তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায় এবং ভগবৎ সেবায় তন্ময় হইয়া নিরন্তর পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকে। জাগতিক সুখ-সম্পদ ত' দূরের কথা 'ইন্দ্রত্ব', 'শিবত্ব', এমনকি 'ব্রহ্মত্ব' পদবী তাহার আকাঙ্ক্ষনীয় হয় না। নিজ কর্মফলে যদি অতি নিম্নকুলেও জন্মলাভ করিতে হয়, তাহাতে সে ভীত হয় না, সর্বাবস্থায় নিষ্কিঞ্চন ভগবদ-ভক্তের সঙ্গলাভ করিতে তাহার একান্ত বাধ্য থাকে। প্রভুকেই গৃহস্বামী জানিয়া নিজেকে ভগবদ্-গৃহের নিত্য প্রহরী বা সেবক বলিয়া অনুভব করে। ভগবৎ সেবায় শারীরিক কিছু কষ্ট হইলেও তাহাতে তাহার কোন দুঃখ অনুভব হয় না, বরং সেবার জন্য অখিল চেষ্টা করিয়াই পরমানন্দানুভব করিয়া বলেন,—

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি।"

—(শরণাগতি—গীতি—১৬)

৬। কার্পণ্য ঃ—

স্বীয় দৈন্য প্রকাশকেই 'কার্পণ্য' বলে, সাধক অভক্ত জীবনের দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্মে দৈন্য বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিতে করিতে বলেন,— "হে প্রভো! আমি মহাপাতকী পতিতাধম এবং আপনি পতিতপাবন শিরোমণি। আপনি যদি বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমার অনন্ত দোষ ছাড়া কোনই গুণ পাইবেন না। সুতরাং বিনা বিচারে এ-অধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করুণ।"

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে যদুচিতং যদুনাথ তদাকর ॥"

হে যদুনাথ! আপনা হইতে পরম কারুণিক কেহ নাই এবং আমা হইতে শোচ্যতমও কেহ নাই, হে হরে! এই প্রকার জানিয়া আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করা উচিত, তাহাই করুন।

"জ্ঞান লব হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিত বন্ধু তুহু, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায় ॥
বিচারিতে আবহি গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর ছোড়ত বিচার ॥"

ভগবৎ চরণে শরণাগত হইবার সহজ উপায়—

এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে ভগবানকে আমরা এই বদ্ধ ভূমিকায় চর্ম্ম-চক্ষে দর্শনই করিতে পারি না, তাঁহার শ্রীচরণে কি প্রকারে শরণাগত হইব? এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার সেবা করিব?

ভগবৎ পাদপদ্মবিস্মৃত মায়াবদ্ধজীবগণকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য পরমকারুনিক শ্রীভগবান্ তাঁহার বিশেষ বিশেষ পার্ষদগণকে এ জগতে নিত্যকাল প্রকট রাখেন, সংসারজাল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য যখন বদ্ধজীবের একান্ত আগ্রহ হয়, তখন ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার কোন প্রিয় পার্ষদকে উহার নিকট পাঠাইয়া থাকেন। তখন যদি সে ভাগ্যক্রমে উক্ত ভক্তের সহিত কোন প্রকার প্রীতির ব্যবহার অর্থাৎ দান, প্রতিগ্রহ, ভগবৎকথা আলাপ-আলোচনা, ভোজনদান ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারে তবে তৎক্ষণাৎ ভক্তি মহাদেবী তাহার হৃদয়মনে উপবেশন করিয়া থাকেন। গো-বৎসের পশ্চাতে গাভী যেমন অনুগমন করে, ভগবান্ও সেইরূপ সর্ব্বদা ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবানের

প্রিয় ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইতে পারিলেই ভগবানের শরণাগত হওয়া যায়, ইহাই ভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগত হইবার সহজ উপায়।

শরণাগতের সেবাই ভগবান গ্রহণ করেন—

যতদিন জীব শরণাগত না হইতে পারে, ততদিন ভগবানের সেবা হয় না। শরণাগত না হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না। সম্বন্ধবিহীন সেবাকে ব্যভিচার বলে। ঐ প্রকার সেবায় প্রেমফল লাভ করা যায় না, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া অনেকে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, বলের দ্বারা ভগবদ্ ভজন করিতে আরম্ভ করে, স্বেচ্ছাময় জীবন যাপন করার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া তাহারা শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে চায় না। তাহারা সাধনে যতই আড়ম্বর করুক না কেন তাহারা কোন মতেই ভক্তির মুখ্যফল প্রেম লাভ করিতে পারে না, বৃথা পরিশ্রম তাহাদের সার হইয়া থাকে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে
আর সব মরে অকারণ।"

শরণাগতের "তদীয়াভিমান" ভাবের উদয় হইয়া থাকে, সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অধিকার অনুরূপ সেবা যোগ্যতা লাভ হয়, সুতরাং ভক্তিরাজ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে হইলে, আদৌ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় করিয়াই ভগবদ ভজন করিতে হইবে ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, এইজন্য ভগবদ্ প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবে যাহারা সর্বতোভাবে শরণাগত হয়, তাহাদের সেবা ভগবান্ অতি প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।

ভগবান শরণাগতকে আপন বলিয়া জানেন—

শরণাগতের শত সহস্র দোষও ভগবানের চোখে পড়ে না। তাহার সমস্ত প্রাক্তন দোষও ক্ষমা করেনই, এমনকি দৈবাৎ কোন পাপ কার্য্য করিলেও বিনা প্রায়শ্চিত্তে তিনি তাহার দোষসমূহ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সাধু বলিয়াই জানেন।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও আমার অনন্যভাবে ভজনকারীকে সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু তিনি মদর্থে অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট।

খলমতি, ক্রোধপরায়ণ, কালীয়নাগ, পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়াও যখন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া করযোড়ে কৃপাপ্রার্থনা করিল, তখন দয়াল শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। অহঙ্কারে প্রমত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'বাচাল' 'বালিশ' 'অজ্ঞ' 'পণ্ডিতাভিমানী' 'মর্ত্য'—প্রভৃতি বলিয়া গালি প্রদান করিয়াছিল এবং গোপগোপী গোধন সহ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য 'সম্বর্ত' আদি মহামেঘগণ দ্বারা মুষলধারে ক্রমান্বয়ে সাতদিন বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রণতপালক গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়া সর্ব্বব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে হত দর্প ইন্দ্র লজ্জিত ও শরণাগত হইল এবং ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি পূর্বক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তখন তিনি উহার দর্পচূর্ণ করিয়া স্নেহপূর্ব্বক কৃপা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ভূতপতি শিব, অন্যান্য দেবগণ ও অসুরগণ অপরাধ করিলেও শরণাগত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শরণাগতের প্রার্থনাই শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ করেন—

ভক্ত নিজের জন্য কখনই কিছু প্রার্থনা করেন না, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলেই স্বীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক বাসনা-সিদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট আবেদন করিয়া থাকে, তাহাদের তুচ্ছ আবেদনের কথা ভগবান কর্ণপাতও করেন না, কারণ উহা শ্রবণ করিতেই তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্ত নিষ্কাম, তাই তিনি ভক্তহৃদয়ে নিরন্তর সুখে বিশ্রাম করেন, ভক্ত সর্ব্বদা ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন থাকেন, ভগবানের কোন বিশেষ সুখকর সেবা-

সমাধানের জন্য ভক্ত যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাহা অতি শীঘ্রই পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তৎপাদপদ্মে সেবার ও শরণাগত সেবকের প্রতি বাৎসল্যের কথা জ্ঞাপন করিতেছেন—

"ত্বৎপাদুকে অবিরতং যে পরিচরন্তি
ধ্যায়ন্ত্য ভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি-তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে।"

(শ্রীভা ১০।৭২।৪)

হে পদ্মনাভ! প্রভো! যাহারা নিরন্তর ভবদীয় অশুভ নাশন পাদুকাযুগল দেহ দ্বারা পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারা ধ্যান ও বাক্য দ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাহারা ভববন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং যদি কোন রূপ কাম্য বিষয়ের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজ-চক্রবর্তীগণেরও বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শরণাগত ভক্তের বিষয় বলিয়াছেন—

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।"

(শরণাগতি ১ম গীতি)

বিমুখ জীবের মঙ্গলার্থে দশমূল শিক্ষা

বিমুখ জীবেরে কৃষ্ণ উন্মুখ করিতে।
তিনরূপ হইলেন—বিদিত জগতে।
(১) শাস্ত্রগুরু (২) মহান্তগুরু (৩) চৈত্ত্যগুরু আর।

জীব লাগি কৃষ্ণের এ তিন অবতার ॥
ভক্ত আর ভাগবত রূপে পরকাশি।
জীবেরে করিল ধন্য অজ্ঞান বিনাশি॥
শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে।
ভুবনে প্রকট হৈল আচার্য্য রূপেতে॥

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ও আশ্রয় লীলা

বিষয় আশ্রয় ভেদে কৃষ্ণ লীলা দুই।
প্রেমানন্দ আস্বাদনে দুইরূপ হই॥
আপনি আপন সেবা করিয়া শিখায়।
আপনি না কৈলে কারে শিখান না যায়॥
এমত দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।
বদ্ধজীব প্রতি তাঁর এত দয়া হয়॥
সেব্য হ'য়ে কৃষ্ণ করে বিষয় গ্রহণ।
গুরুরূপে সেবা করি শিখান সেবন॥
শাস্ত্রের নিগূঢ় শিক্ষা আপামর জনে।
আচরিয়া ব্যাখ্যা করে মধুর বচনে॥

মহান্তগুরুর দয়া ও ষড়্‌বিধ শরণাগতি

তাহার অমিয় বাণী করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণ পদে লয় জীব একান্ত শরণ॥
লালন (২) রক্ষণ কৃষ্ণ অবশ্য করয়ে।
ইহা জানি প্রভু পদে (৩) আত্ম সমর্পয়ে॥
ভক্তি অনুকূল কার্য্য স্বীকার করয়॥

ভক্তি প্রতিকূল ভাব অবশ্য বর্জ্জয় ॥
দম্ভ ত্যজি (৬) দৈন্যভাবে লয়েন শরণ ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন গ্রহণ ॥
কৃষ্ণদাস অভিমান যার দৃঢ় হয় ।
মায়াদাস্য ভুলি সেই কৃষ্ণেরে সেবয় ॥

মহান্তগুরুর আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন :—

দশমূল প্রমাণ—১

একান্ত আশ্রয় করি শ্রীগুরু চরণ ।
শাস্ত্র অনুসারে করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥

প্রমেয়—৯

২। কৃষ্ণই পরতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ।
তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা—জগত ঈশ্বর ॥
সৎ-চিদানন্দময়—স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁর শ্রেষ্ঠ নাহি কেহ, নাহিক সমান ॥
মায়াগন্ধ নাহি তাতে, অপ্রাকৃতরূপ ।
নবীন কিশোর কৃষ্ণ, তাহার স্বরূপ ॥

৩। কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্

চিৎ অচিৎ-জীব তিন শক্তিতে গণন ।
কৃষ্ণই ত্রিশক্তিধৃক্ বেদের বচন ॥
ইচ্ছামাত্র অসম্ভব সম্ভব করান ।
তে কারণে কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশক্তিমান ॥

৪। কৃষ্ণই রসসমুদ্র

সর্ব রসের আকর কৃষ্ণ দয়াময়।
"রস বৈ সঃ" বলি বেদে যারে কয়॥
রসিক শেখর কৃষ্ণের অদ্‌ভূত লীলা।
প্রিয়জন প্রীতিবশে সদা করে খেলা॥
জগৎ আকর্ষে তার মূরলীর তানে।
অসমোর্দ্ধ রূপে মোহে সর্বভক্তগণে॥

৫। জীব বিষয়েঃ—

৬। কৃষ্ণ ভুলে বদ্ধ হয়

(৫) জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—তাহার স্বরূপ।
(৬) কৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ স্ফুলিঙ্গ যেরূপ॥
তটভূমে অবস্থান—দুই দিকে গতি।
কৃষ্ণভুলি বদ্ধ হয়, জড়ে হয় মতি॥

৭। কৃষ্ণোন্মুখ হ'লে মুক্ত হয়ঃ—

শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হলে পুনঃ মুক্ত হয়।
এ কারণে তটস্থাখ্য বলি জীবে কয়॥
কৃষ্ণপূর্ণ চিৎবস্তু মায়ার ঈশ্বর।
মায়াবশ-যোগ্য জীব—ইহাই অন্তর॥

৮। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

৯। ভক্তি অভিধেয়

স্বতন্ত্র স্বভাব বশে ভোক্তাভিমানে।
তটস্থাখ্য জীব পড়ে মায়ার বন্ধনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈবে ভক্ত সঙ্গ পায়।

মায়াবন্ধ ঘুচে, অনায়াসে মুক্ত হয়॥
মায়াবশ—মায়াধীশ জীব কৃষ্ণে ভেদ।
চেতনত্বে উভয়েই হয়ত' অভেদ॥
জীব-কৃষ্ণে ভেদাভেদ নিত্যকাল রয়।
স্বরূপে সকল জীব কৃষ্ণরে সেবয়॥

৯। ভক্তি অভিধেয়

ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ ভজে পায় প্রেমধন।
তাহা লভিবারে হয়, ভক্তিই সাধন॥
কর্ম-জ্ঞান ছাড়ি ভক্ত্যে কৃষ্ণেরে ভজয়।
অনন্য ভজনে কৃষ্ণ, ভক্তবশ হয়॥

১০। প্রেমই প্রয়োজন

এই শুদ্ধ ভক্তি বলে প্রেম লভ্য হয়।
ঐকান্তিক ভক্তি বিনা প্রেম প্রাপ্য নয়॥
সাধকের একমাত্র প্রেম প্রয়োজন।
প্রেমে বশীভূত হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

নববিধ ভক্তি তার স্বরূপ লক্ষণ।
বাঞ্ছাশূন্য হৈলে হয়, তটস্থ লক্ষণ॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ে অপর সাধন।
তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য প্রেম ভক্তের জীবনে।
তাহা লভি নিত্য সেবে, রহে কৃষ্ণ সনে॥
দশমূল দুই ভাগে প্রকাশ পাইল।
প্রমাণ এক প্রমেয় নয়টী হইল॥

প্রমেয় ত্রিবিধরূপে পুনঃ প্রকাশিল।
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনে ব্যক্ত হৈল ॥
সম্বন্ধ তত্ত্ব সাত ভাগে হৈল বিজ্ঞাপিত।
কৃষ্ণতত্ত্ব তিন রূপে হৈল প্রকাশিত ॥
জীবের সম্বন্ধে চারি হইল বিচার।
কৃষ্ণ জীবে অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রচার ॥
অভিধেয় ভক্তি এক প্রেম প্রয়োজন।
সবে মিলি দশমূল শিক্ষা প্রকটন ॥
দশমূল পান কৈলে ভবরোগ যায়।
দুর্ল্লভ ঔষধ—প্রকাশিল গৌর রায় ॥
ভবরোগ বৈদ্য শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু আমার।
দশমূল মহৌষধ করিল প্রচার ॥

অকিঞ্চন শরণাগত ও শুদ্ধভক্ত জীবন

অকিঞ্চন—

"কৃষ্ণদাস্য" জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম হইলেও বৈমুখ্যের দরুণ সে মায়ার আপাততঃ চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে বিষয় ভোগে প্রমত্ত হয়। বিষয়ের এমনই স্বভাব যে, উহার একবার স্পর্শ হইলেই মাকড়সা জালবদ্ধ মক্ষিকার ন্যায় নিজের শত চেষ্টা ফলেও জীব মায়াজাল হতে বহিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না বরং আরো আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মায়াবদ্ধ জীব বহু দুঃখ-কষ্টরূপ ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হলেও সে নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না—অধিকন্তু আরো সংসার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম করায় যাতে ভববন্ধ॥

এইপ্রকারে জীব সংসারে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে নিদারুণ দুঃখভোগ করিতে করিতে কোন সুকৃতির ফলে তার বিষয়েতে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

"বহুজন্মের থাকলে ভাগ্য।
বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য॥"

যখন কোনো ভাগ্যবান জীবের বৈরাগ্যোদয় হয়, তখন তাঁর বর্ণাশ্রমের কোন কর্ম্মেই কোন রুচি থাকে না। "কতৃত্বাভিমান", "ভোগস্পৃহাদি" তাঁর আর ভাল লাগে না। তিনি ক্রমশঃ মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয় ষড়বেগজয়ী হয়ে থাকেন। কাহার প্রতি তাঁর কোন হিংসা-বিদ্বেষ বা আসক্তি মমতা থাকে না। শোকের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি শোকে অভিভূত হন না—শত্রু-মিত্রে সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন হন—কোন বিষয় বা ভোগ্য বস্তু পাইবার আকাঙ্খাও করেন না—এইজন্য তাঁহাকে "অকিঞ্চন" বলা হয়। তিনি নিজ জ্ঞান বৈরাগ্যের বলে ভগবৎ নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

শরণাগত—

অকিঞ্চনের ঐ সমস্তগুণ শরণাগত ভক্তের মধ্যেও অবস্থিত থাকে। অধিকন্তু তাহাতে "আত্মসমর্পণ" নামক একটি অধিকগুণ প্রকাশ পায়।

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

জীব যখন রোগ-শোক-জরা-ব্যাধী অভাব অনটন আদি দ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও আর্ত্ত হইয়া নিজের চেষ্টায় কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না, তখনই তিনি অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে কায়-মন-আত্মাদি সর্বস্ব

সমর্পণ করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে আপনবোধে লালন পালন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু শরণাগত ভক্ত নিজের পোষণের জন্য আর কোনো চেষ্টাই করেন না। আর অকিঞ্চন ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-বৈরাগ্যের বলে চলিতে গিয়া অনেক সময় বিপথগামী হইয়া পড়েন।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ॥

এইজন্য অকিঞ্চন হইতে শরণাগতের ভূমিকা অনেক উন্নত। শরণাগত ভক্ত জানেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আমাকে মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে এবং প্রকৃষ্টরূপে পালন-পোষণ করিতে সমর্থ,—অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। শরণ গ্রহণ-আকাঙ্খী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদেবের অলৌকিক বাৎসল্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ হিতোপদেশে ভগবানের অর্চ্চনামূর্ত্তির সেবায় ও ভক্তির অন্যান্য অঙ্গসমূহ যাজন করিতে থাকেন। প্রাক্তন দুষ্কর্মের জন্য অনর্থসমূহ তাহাকে ভজনে অগ্রসর হইতে বিঘ্ন করিলেও তিনি বিশেষ যত্নের সহিত ভক্ত্যংগ যাজন করেন।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

অসৎসঙ্গাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ঐকান্তিক শরণাগত হওয়া বড় সহজ কথা নহে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে রুচি ও বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকিলে শরণাপত্তির উদয় হয় না।

অসৎসংগ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রীসংগী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।

অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

শরণাগত ভক্তের দৈন্যই ভূষণ। এইজন্য তাঁহার হৃদয়ে দম্ভ-অহংকার-কর্ত্তৃত্বাভিমান আদি অবগুণ থাকে না। অধিকন্তু ক্ষমা-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মহৎ-গুণ থাকিলেও তিনি নিরভিমান হন। তিনি ভগবচ্চরণে কায়-মন-বাক্য এমনকি আত্মা পর্যন্ত সব কিছু অর্পণ করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণকে নিজের পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা বলে তিনি বরণ করিয়া থাকেন। ভক্তির প্রতিকূল কর্ম্ম তাঁর আর ভাল লাগে না বলেই তিনি উহা বর্জ্জন করেন। ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম আনন্দের সহিত অনুষ্ঠান করেন। তাই কৃষ্ণ শরণাগতিকে দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

দৈবী হেযা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শরণাগতি ভক্তিমার্গের প্রাথমিক সোপান। শরণাগতি ছাড়া ভগবানের হওয়া যায় না—অর্থাৎ উহা বিনা কৃষ্ণ তাকে আত্মসাৎ করেন না। ত্বাং বিনা তদীয়ত্বে অসিদ্ধে।"

শরণ লইয়া করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

আত্মনিবেদনকারী শরণাগতকে রক্ষা করে কৃষ্ণের একটা মস্তবড় দায়িত্ব। তিনি শরণাগত-পালক, তাই প্রকৃত বুদ্ধিমান জন একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

এইপ্রকারে ভগবৎকর্ত্তৃক রক্ষিত শরণাগত ভক্ত অন্তরের অন্তস্থল হইতে অনুভব করে :—

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥

আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥

শরণাগত ভক্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে সেবা করিতে আরম্ভ করেন। স্বতঃ প্রণোদিত সেবাবৃত্তি প্রথমে তাঁর হৃদয়ে উদিত হয় না, তাই তিনি প্রথমে আজ্ঞাকারী ভৃত্যরূপে সেবা করিতে থাকেন। আমি বিদ্বান্ "আমি বুদ্ধিমান", —আমিসব কিছু জানি,—সবকিছু বুঝি,—এই প্রকার দুর্বুদ্ধি স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছা-চারিতা তাঁর হৃদয়ে কখনও জাগে না। তিনি নিজেকে শ্রীহরির, তদীয় প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুদেবেরও তদীয় বৈভব বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে চির বিক্রীত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য-রূপে জানেন। তিনি তাঁদের আদেশ নির্দেশ বিনা বিচারে পালন করেন।" গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" মস্তিষ্ক পরিচালনা করা তাঁর কার্য নহে,—শ্রীগুরু-দেবের নির্দ্দেশ অনুসারেই সেবা করেন। গুরুদেবের ইঙ্গিত বা মনোঽভীষ্ট বুঝিয়া সেবা করিবার অধিকার এখনও হয় নাই। তিনি নিজেকে 'পাল্য' জ্ঞানে পালিত ও রক্ষিত, হতে চান। নিজের রক্ষা বিধানের জন্য কোনো চেষ্টা করেন না। তাঁহার দেহ-গেহ-পুত্র, কলত্র, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করে তিনি সমস্ত "দায়" হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে চান।

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেল তুয়া ওপদ বরণে॥

শুদ্ধভক্তজীবন—

শুদ্ধভক্তজীবনে অকিঞ্চনের 'অকিঞ্চনতা' ও শরণাগতে 'আত্মসমর্পণ' বৃত্তি" ত' থাকেই অধিকন্তু তাঁর হরিতোষণ হরিসেবন বা হরিসুখবিধান বৃত্তিও থাকে। সুতরাং অকিঞ্চন ও শরণাগত জীবনের পরিপক্ক বা উন্নতস্তরের কথা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তজীবন। এই ভক্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—শ্রীহরির তোষণ-মূলা সেবা। হরিসেবায় স্ব-সুখ কামনা বৃত্তি থাকে না, ইষ্টতোষণ পরতাই তাঁর প্রাণ। হরিতোষণ করিতে যদি তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেও হয় এবং তাহা হইলে ভক্ত ঐ দুঃখকেও পরম সম্পদ বলিয়া অনুভব করেন। তখন আনুসঙ্গিকক্রমে ঐ ভক্তের যাবতীয় অবিদ্যাদি বিদুরিত হইয়া যায়। ভক্ত সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীগোবিন্দের সেবা করে সর্ব্বদা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত থাকেন।

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।"

সর্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের হৃদয়ে সুখে অবস্থান করেন। তাই ভক্তগণ তদ্গতচিত্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্গতভাব অবগত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট পরিপূরক সেবা করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ আদেশ বা নির্দ্দেশের অপেক্ষাও করিতে হয় না।

ঐপ্রকার ভক্তগণ মৃত্যুকেও ভয় করেন না। তাঁহারা বলেন—

ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এদেহ ছাড়িয়া দিব।

শুদ্ধ ভক্তগণ এই নশ্বর শরীর ত্যাগ করে যেখানে গেলে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় না, সেই চিন্ময় গোলকধামে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক পার্ষদদেহে নিত্যসেবায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমিকার কথা আর কিছুই নাই।

ভক্তিসাধকের ষড়্বেগ দমনের সহজ উপায়

শ্রীকৃষ্ণের সুখকর অনুষ্ঠানই বিশুদ্ধভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ লীলার বিষয়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি-নবধাভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন হয়। ইহার দ্বারাই অবাঙ্মানসগোচর শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়—তাঁকে প্রেমে বশীভূত করা যায়। এইজন্য ভক্তগণ এই ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—

"ভক্ত্যা মাং অভিজানাতি।"

ভক্তির অনুকূল অনুশীলন যেমন ভক্তগণের অবশ্য করণীয় তেমনি ভক্তির প্রতিকূল কর্মসমূহ পরিত্যাগ করাও তাহাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

ভক্তিযাজিগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন না করিয়া ভক্তির স্বরূপলক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গ যাজন করিতে থাকেন, কারণ তাহাদের বিশ্বাস আমরা পাপ বা পুণ্য যাহাই করিনা কেন, কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেই সর্বপাপাদি নাশ হইবে, "অজামিলের ন্যায় আমরাও মৃত্যুকালে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া বৈকুণ্ঠ যাইতে পারিব, নাম বলে পাপবুদ্ধি যে একটা নামাপরাধ এবং ইহার ফলে যে ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুত হইতে হয় ইহা তাহারা চিন্তাও করে না, তাই তারা সংখ্যা নাম জপ করে হরিকীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করে, শ্রীবিগ্রহহের অর্চন করে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে,—ভোগরন্ধন করে—মন্দির মার্জন আদি সেবা করে এই প্রকারে বহু বৎসর সেবা করিয়াও দেখা যায়—তাহাদের চিত্তের চাঞ্চল্যরূপ

অনর্থের বিনাশ হয় না। এমনকি হঠাৎ কোনো ভক্তি প্রতিকূল দুর্নৈতিক কার্য্যও করিয়া বসে, শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে নৈমিষারণ্যে বলেছেন —

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

ভাঃ ১।২।৭

ভগবানে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে ভক্তির প্রভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বকথিত ভক্তিযাজিগণের ভক্তি বিরোধী পাপের স্পৃহা যায় না কেন? ইহার উত্তরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলেছেন—মহাপাপী শ্রীজগাই মাধাই যেদিন হইতে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা লাভ করে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, সেইদিন হইতে তাঁরা আর কখনও ভক্তি-বিরোধী কর্ম করেন নাই, উহারা শ্রীগৌসুন্দরের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আজ হইতে আমরা আর পাপ করিব না।

"প্রভু বলে—তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ ॥"

তাই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উহাদের পূর্বকৃত যাবতীয় পাপরাশি বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁদের কৃপায় উহারা মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন, এইজন্য ভক্তিসাধকগণকে ভক্তি বিরোধী কর্ম পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প করিতে হয়, "ভোগও করবো—ভক্তিও করবো—এই বিচার করলে সুফল হয় না, দুই নৌকায় পা দিয়ে যেমন নদী পার হওয়া যায় না, অধিকন্তু নদীর জলে পড়ে হাবুডুবু খাইতে হয়, সেই প্রকারে "ভোগভক্তি" একসঙ্গে করতে গেলে ভক্তির ফল "প্রেম" ত লাভ হবে না—অধিকন্তু সংসার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে অনন্ত দুঃখভোগ করতে হবে। ভক্তি-প্রভাবে ভক্তিযাজীর প্রাক্তন পাপ সমূহের বিনাশ এবং ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে—অধিকন্তু ভগবদ্

বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। যে সকল সাধকগণ প্রতিকূল বর্জনে কোন চেষ্টা না করে কেবল ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন, তাঁদের জড়বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় না, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা ত দূরের কথা,

কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায়-কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

এইজন্য ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণেব চিত্তকে ভক্তি প্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌর প্রেষ্ঠবর শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতগ্রন্থে প্রথম শ্লোকেই ভক্তিপ্রতিকূল ষড়বেগ দমনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ষড়বেগ যথা "বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ জিহ্বাবেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ ষড়বেগের বশীভূত হইলে তথাকথিত ভক্তিসাধকগণকেও সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মহাদুঃখভোগ করিতে হয়। সুতরাং ভক্তিযাজীগণকে অনুকূল অনুশীলনের সঙ্গেসঙ্গে ষড়বেগাদি ভক্তিপ্রতিকূল কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে, ষড়বেগদমন চেষ্টা ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ না হইলেও ভক্তি মন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতা প্রদান করে, উহা দমন করিতে না পারিলে উহার উত্তেজনায় সাধকগণকে ভক্তিমার্গ হইতে বিপথগামী করাইয়া দেয় তখন উহারা ষড়বেগের বশবর্তী হয়ে কামক্রোধের লাথি খাইতে খাইতে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি চুরাশী লক্ষ-যোনী পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে ডুবায়।

এই সব বেগের হস্ত হতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্যমুক্ত ভক্তগণের ঐকান্তিক শরণ গ্রহণ করিতে হয়, যখন সাধকগণের হৃদয়ে কাম-ক্রোধাদি প্রবল বেগের প্রকোপ হয়, তখন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিতে হয়।

"আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লৈয়া,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু সেনাগণে, কৃপা করি নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥"

* * *

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আবেদনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাধকগণের সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূলতা বিনাশ করিয়া তাদের প্রেমে বশীভূত হয়ে পড়েন। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইবার পূর্বে তাহাদিগকে অনেক পরীক্ষা করেন। "ভক্তগণ সত্য সত্য আমাকে (ভগবান্) চায়, না তুচ্ছ ভুক্তি-মুক্তি কামনা করে।" ইহা তিনি জানিতে চান। ভক্তের হৃদয়ে যদি "লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা" "ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি" কামনার উদয় হয়, তবে কৃষ্ণ তাহাদিগকে ঐসব তুচ্ছ বস্তু প্রদান করিয়া বঞ্চনা করেন, কখনও শুদ্ধ ভক্তি দান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

ভক্তিযাজী পুরুষ শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত হইলেও যদি অজিতেন্দ্রিয় হয় বা ষড়্‌বেগের দাস হয়, তাহা হইলে সে ভগবদ্ কৃপা লাভে চিরবঞ্চিতই হয়। অপক্কসাধকের হৃদয়ে ভক্তিবাধক ষড়্‌বেগের প্রকাশ হইলে সাধনে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে

পারে না। এই ষড়বেগ বিক্রম ও উহা দমনের সহজ উপায় বিষয়ে মহাজনগণ জানাইয়াছেন—

(১) যে বাক্যের দ্বারা অন্যের উদ্বেগ হয়, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ-কলহ-লড়াই সংঘটিত হয়, তাহাকেই "বাক্যবেগ" বলে। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের দ্বারাই এই বাক্যবেগ দমিত হয়। "যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই।"

(২) কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যাভিলাষীর চেষ্টা সমূহে মনে যে অব্যক্ত বেগের উদয় হয়, উহাকেই "মনোবেগ" বলা হয়। এই বেগের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ ভক্তি-বিরোধীমূলক মহা-মহা-পাপ ও অপরাধ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলা সমূহের নিরন্তর স্মরণ প্রভাবে এই মনোবেগ দমিত হয়।—

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

(৩) অন্যাভিলাষের অতৃপ্তিতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধবেগের উদয়ে মানুষ হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া স্বজনগণকেও বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—এমনকি অতি প্রিয় নিজ শরীরকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে। যারা ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি যাঁরা ক্রোধ প্রয়োগ করেন, তাঁদের ক্রোধবেগ দমিত হয়। "ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষীজনে।" ইহাই ক্রোধবেগ দমনের উপায়।

মুখরোচক সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনস্পৃহাকেই জিহ্বাবেগ বলে। কটু-অম্ল-তিক্ত-লবন, কষায়-মধুর—এই ষড়রসের বশীভূত হইয়া মানুষ মৎস্য, মাংস-মদ্য প্রভৃতি অমেধ্য-কুমেধ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া মহা-মহা-পাপকার্য্য করিয়া বসে। এমনকি

জিহ্বার লালসে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-পরমান্ন-পুপ্পান্ন প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভক্ষণের স্পৃহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনোপযোগী শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুরূপ ভগবৎ প্রসাদ সেবনের দ্বারাই এই জিহ্বাবেগ দমিত হয়।

(৫) জিহ্বাবেগের বশবর্তী হয়ে মুখরোচক সুস্বাদু দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে গেলেই উদরবেগের বশীভূত হইতে হয়। এই বেগের বশবর্তী-জন আমাশা, উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া সারাজীবন মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। একাদশী-জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতদিবসে নিরম্বু উপবাস করিলে এবং অনিবেদিত দ্রব্য পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎ-প্রসাদ প্রয়োজন অনুরূপ সেবা করিলে উদরাবেগ নিবৃত্ত হয়।

"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথারোগ।"

* * *

"প্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।"

(৬) স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ-লালসাকেই "উপস্থবেগ" বলে। এই বেগের বশবর্তী হইলে মানুষ অবৈধভাবে স্ত্রী-সংসর্গ দ্বারা জড়েন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া মহা-মহা-পাপে আসক্ত হইয়া পড়ে।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

এই বেগ দমন করার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম আশ্রয়পূর্বক সমুচিত বিশিষ্ট কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বিধিমতে নিশিচর্য্যা-পালনপর হইয়া বৈধ চেষ্টা দ্বারা উপস্থবেগ সংযত করেন। ত্যক্তগৃহী বৈষ্ণবগণের যাহাতে মনের

কোনপ্রকার বিকার না হয়, তাহার জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যুবতী স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী পুরুষগণের সংসর্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবেন। গৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ত্যক্তগৃহী সাধকগণকে সতর্ক করিয়া শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

স্বপ্নেও না কর ভাই স্ত্রী সম্ভাষণ।
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, সমস্ত ভোগের উপকরণ তাঁহারই ভোগের জন্য। সুতরাং শুদ্ধ ভক্তগণ কৃষ্ণভোগ্য বস্তুসমূহে ভোগ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ সম্বন্ধ বিচারে সর্বদা সেব্য দর্শন করেন।

ধীরা পশ্যন্তি নারায়ণময়ং জগৎ।

* * *

যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

যে সকল ভক্তগণ এই ষড়বেগের বিক্রম সম্যক্‌রূপে দমন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত "গোস্বামী" পদবাচ্য—তাঁহারাই জগদ্‌গুরু।

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।

ঐপ্রকার ষড়বেগজয়ী একজন শুদ্ধভক্ত আচার্য্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে শিক্ষা করিতে সমর্থ। এইজন্য ভগবদ্-ভক্তগণ সর্বত্র পূজ্য-বরেণ্য-সেব্য। দেখুন—ভক্তরাজ দেবর্ষিনারদ ভক্তিবলে বলীয়ান হইয়া সর্বজীবে কার্ষ্ণদর্শন করেন। তিনি কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, কি নরকে, সর্বত্র সর্বদাই সর্বজন পূজ্য। তাঁহার কোথাও কোন শত্রু নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠও প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রেষ্ঠা শ্রীরাধার মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া সর্ব-প্রথমেই ভক্তি সাধকগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে গিয়া ষড়বেগ দমন করিবার উল্লেখ করিলেন। যদিও এই ষড়বেগ দমনকারীকে শুদ্ধভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ

বলা যায় না, তথাপি ইহা ভক্তিযাজনে বিশেষ আনুকূল্য বিধান করে বলিয়াই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বিশেষভাবে এই ষড়বেগ দমনের উপদেশ করিয়াছেন; এই ষড়বেগজয়ী ভক্তই জগদ্গুরুরূপে নিত্যকাল সর্বজনবরেণ্য পূজ্য হন।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
এই ষড়বেগ যার বশে সদা রয়।
সে জন গোস্বামী, করে পৃথিবী বিজয়॥

শ্রীবিগ্রহ সেবা

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবসমূহের মূল স্রষ্টা, পালয়িতা ও বিনাশকারী। তিনি সকলের আদি, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহ নাই। তিনি বিগ্রহবান্, রূপবান্, গুণবান্ এবং স্বীয় পার্ষদগণ-সহ নিত্যলীলাবিলাসী। তিনি স্বীয় চিন্ময় গোলকধামে প্রিয় পরিকরগণসহ সর্বদা প্রেমানন্দ আস্বাদনে প্রমত্ত আছেন। তিনি অশোক-অভয়-অমৃতের একমাত্র আধার, রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি একস্থানে অবস্থান করিয়াও

সর্বত্র বিদ্যমান থাকিতে পারেন। তিনি এক হইয়াও বহুমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক বিভিন্ন রসের সেবকগণের সঙ্গে বিভিন্ন ধামে বিচিত্র লীলা-বিলাস করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভোলা, মায়াবাদ, ত্রিতাপদগ্ধ ও মর্ত্ত্যজীবগণকে স্বীয় পাদপদ্মে উন্মুখ করার জন্য পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজশক্তি সঞ্চারিত কোন কোন অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে এ জগতে প্রেরণ করেন, সেইসব জীব-বান্ধব-ভগবদ্ ভক্তগণ বিমুখ জীবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্বক পরমানন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণ-মহিমার কথা কীর্ত্তন দ্বারা উহাদিগকে অহৈতুকভাবে ভগবৎ পাদপদ্মে উন্মুখ করাইতে চেষ্টা করেন।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিনাং দীনচেতসাম্ ॥
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।৮।৪)

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

এই সর্বজীববান্ধব ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি যখন আত্মঘাতী অপরাধী ও অসুর প্রকৃতি জীবগণ প্রবল নির্যাতন করিতে থাকে তখন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং বা নিজের কোন অবতার দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিয়া নিজপার্ষদগণকে রক্ষা করেন এবং ভাগবতধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্বক জগজ্জীবের মঙ্গল বিধান করেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

(শ্রীগীতা—৪।৭-৮)

অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনন্ত অবতারগণ অসুর সংহার ও ভক্ত বিনোদনার্থে এই মর্ত্ত্যজগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

"অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥"
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।২৪৮,২৪৫-২৪৬)

সর্বেশ্বরেশ্বর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় চিন্ময়ধাম হইতে যে যেরূপ পরিগ্রহণ পূর্বক এ মর্ত্তজগতে প্রকটিত হন, সেই সেই স্বরূপকেই অবতার বলা হয়।

"সৃষ্টি হেতু যে মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি "অবতার" নাম ধরে।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬৩)

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (১) "নাম" ও (২) বিগ্রহরূপে আরও দুইটি অবতার পরিগ্রহ করেন।

(১) কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২

"নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪)

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২১)

(২) শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে যে অবতার গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, যেরূপ 'শ্রীনাম' 'নামী কৃষ্ণ' হৈতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ শ্রীবিগ্রহও স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।

"নাম', 'বিগ্রহ', স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিন 'ভেদ' নাহি 'তিন—চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর 'নামনামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম-নাথ-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১-১৩২)

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা দেহ অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা উহা দর্শন করা যায় না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

(শ্রী চৈঃ চঃ ম ৯।১৯৪)

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপালেশ যাহার প্রতি হয়, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে, অন্য কেহ শত শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৬।৮৩)

ভগবৎ কৃপালব্ধ ভক্তগণ চিন্ময় চক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্বরূপ সর্ব্বদা দর্শন করেন এবং চিদেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বক্ষণ তাঁহার সুখকর সেবা করেন এবং জগদ্-বাসী জনগণকেও তাঁহার অপূর্ব সেবার সুযোগ দিবার ইচ্ছা করেন, তখন কোন কৃপাসিঞ্চিত ভাস্করের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ধন আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ করাইয়া মন্দিরাদি নির্মাণপূর্বক সেবা প্রবর্ত্তন

করেন। এই শ্রীবিগ্রহসেবা মনঃ কল্পিত পুতুল পূজা নহে। শ্রীবিগ্রহসেবার দ্বারা সাক্ষাৎ স্বরূপেরই সেবা হয়। শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব প্রভৃতি মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই নিত্য চিন্ময় স্বরূপের বিষয় শাস্ত্রে ও ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিয়াছেন, পরবর্ত্তিকালে দিব্যদ্রষ্ট মহাভাগবতগণ সাধারণ জনগণকে দর্শন ও সেবার সুযোগ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপকে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভক্তগণের চির আদরণীয়, পূজনীয় ও বরণীয়, এই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ নবনবায়মান আনন্দ অনুভব করেন।

জীববান্ধব মহাত্মাগণ এই মর্ত্ত্যজগতে বিভিন্নস্থানে শ্রীবিগ্রহকে প্রকট করাইয়া জীবগণের যে কি মহান্ মঙ্গলোদয় করার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। সাক্ষাৎ স্বরূপের দর্শন ও সেবা লাভ করা বদ্ধজীবের ভাগ্যে সম্ভব নহে, কারণ, মায়িক বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবক হওয়া যায় না।

"আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধনাশ।
তবে সে হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১০৬)

শ্রীবিগ্রহ বদ্ধমুক্ত সকলকেই সেবার সুযোগ প্রদান করেন, তিনি সচ্চিদানন্দময় হইয়াও সর্ব্বসাধারণের সেবা গ্রহণের জন্য যেন জড়বৎ অবস্থান করেন। তিনি সকলের সেবা বিশেষরূপে গ্রহণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'বিগ্রহ'। তিনি যেন চলিতে পারেন না বলিয়া একস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহাকে কিছু ভোগ নিবেদন না করিলে তিনি যেন খেতে পারেন না, তিনি যেন কথা বলিতে পারেন না, তাই বোবার মত নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন, বহির্দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও তিনি ভক্তের জন্য পদব্রজে সুদূর দেশে গমন পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তিনি সমর্থবান হইয়াও ভক্তপ্রদত্ত অন্ন

গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করেন, তিনি বোবার ন্যায় অবস্থান করিলেও ভক্তগণের সহিত প্রেমালাপ করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করেন।

মায়াবদ্ধ মনুষ্যগণ এবং মনুষ্যেতর জীবগণ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে শ্রীবিগ্রহের যাত্রা মহোৎসবে তাঁহার কিঞ্চিদ্ সেবার সুযোগ পাইয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করে, শ্রীরথযাত্রাদি পর্বকালে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, পাপী-পুণ্যবান্, বদ্ধ-মুক্ত, ভক্ত-অভক্ত, সর্পপ্রকার মনুষ্যগণ—এমনকি অশ্ব গজ আদি পশুগণ পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহের দর্শন ও সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হয়। লৌকিক প্রথানুসারে তাঁহাকে দর্শন, প্রণাম, পরিক্রমণ তাঁহার অধরামৃত সেবন, চরণামৃত পান করিলে অবশ্য জীবের সুকৃতির উদয় হয়, এই প্রকারে 'শ্রীবিগ্রহ' সর্বজীবের সেবা গ্রহণ পূর্বক তাহাদের বাস্তব মঙ্গলোদয় করান।

শ্রীবিগ্রহসেবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন বাস্তব আখ্যান নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

(১) মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলাদির সেবার মাহাত্ম্য,—

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় নিজজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালার সেবা প্রদান পূর্বক উপদেশ প্রদান করেছিলেন—

"প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
* * * * * *
"শ্রীহস্তে-শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥"

"এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দনন্দন।"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩০০)

(২) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবিগ্রহসেবার দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তুলসী মঞ্জরী সহ গঙ্গাজলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রীতিপূর্বক অর্চন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে এ-জগতে প্রকট করিয়াছেন—

"গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম সেতু॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৮-১১০)

(৩) শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে "শ্রীগোপাল বিগ্রহ" প্রকট হলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের সেবা গ্রহণ করার জন্য শ্রীগোপাল বিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কৃপায় জগদ্বাসিগণ ও শ্রীবিগ্রহের সেবার অপূর্ব সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতি শ্রীগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের কৃপার কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন।

"প্রভু কহে—নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবারে স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কৈল॥
যার প্রেমে বশ হৈয়া প্রকট হইলা।

সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা।
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈলা চুরি।
অতএব নাম হৈল "ক্ষীর চোরা হরি।"
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী গোস্বামীর প্রেম উথলিল।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৭১-১৭৫)

বর্ত্তমান এই নাস্তিক্যবাদ পূর্ণ কলিযুগে ও বহু ভাগ্যবান জনগণ শ্রীবিগ্রহ সেবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং করিতেছেন, এখনও শ্রীবিগ্রহের চন্দন যাত্রা স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি পর্বকালে লক্ষ-লক্ষ নর-নারীগণ উৎকণ্ঠিত ও উল্লসিত চিত্তে শ্রীবিগ্রহ দর্শন-লালসায় পুরী বৃন্দাবনাদি তীর্থে এবং মন্দিরে মন্দিরে গমনপূবক বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সুতরাং এই শ্রীবিগ্রহের স্বতঃসিদ্ধ মহিমা মানুষের হৃদয় হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে—অর্থাৎ নিত্যকাল প্রকট থাকিবে।

পিতার অবর্তমানে তাঁহার চিত্রাদি যখন পুত্র দর্শন করে, তখন তাঁহার হৃদয়ে পিতার রূপ গুণ ও কার্য্যাবলীর স্মৃতি অবশ্য উদিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে যদি শৈশবকালেও তাঁহার পিতার দর্শন না পাইয়া থাকে, তবে প্রবীন বান্ধবগণের নিকট হইতে নিজ পিতার মূর্ত্তি আদি বিষয়ে জানিয়া লইলে তাহার পিতার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকিতে পারে না, দিব্যদ্রষ্টা ভগবদ্ ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্রই সাক্ষাদ্ ভগবদ্ স্বরূপের দর্শন পাইয়া থাকেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ স্বরূপ ও 'শ্রীবিগ্রহে' কোন প্রকার ভেদ দর্শন করেন না, এমনকি কোমল শ্রদ্ধ কনিষ্ঠাধিকারী সাধকগণ যাহাদের ভাগ্যে কখনও ভগবৎ সাক্ষাৎকার ঘটে নাই তাঁহারাও শাস্ত্র মহাজনগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি আরোপ পূর্বক প্রীতির সহিত অর্চন করায় ক্রমশঃ ভগবৎ স্বরূপের দর্শনলাভ

করিতে পারেন, একজন ভক্ত-ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিয়া বলিতেছেন।—

"প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য করণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

শাস্ত্র মহাজনগণ ভক্তিমার্গের সর্বনিম্ন স্তর হইতেই শ্রীবিগ্রহার্চনের ব্যবস্থা নির্দেশ দিয়াছেন, এমনকি ভক্তিমার্গের চরম অবস্থাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং অন্যান্য বহু মহাজনগণ নিজ নিজ আচরণে শ্রীবিগ্রহসেবার পরাকাষ্ঠার কথা প্রদর্শন করাইয়া জগদ্বাসীকে শ্রীবিগ্রহের সেবার মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল

নিখিল জীববান্ধব কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অহৈতুকী কৃপা করে জড়বিদ্যাগর্বিত মায়া মোহিত কাশ্মীর প্রদেশস্থ শ্রীকেশব পণ্ডিতকে বলিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল"—

আরও বলেন,—তুমি মহাভাগ্যবান্ তাই তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীসরস্বতীদেবী তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার অকৃত্রিম কৃপায় তুমি আমার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে, বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট ফল—"বিদ্যাবধূ জীবন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ"। লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি বিদ্যার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কারণ এই সব অনিত্য সম্পদ কেবল নশ্বর দেহ সম্পর্কীয় হওয়ায় দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে উহাদেরও নাশ হয়, তাই চতুর ভক্তগণ ঐ নশ্বর ধন-বিদ্যা-রাজ্য ঐশ্বর্য্য

আদির মোহ পরিত্যাগ করে আত্মার নিত্যবান্ধব পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কায় মনোবাক্যে প্রীতিপূর্বক ভজন করেন। সুতরাং তুমি জড়ীয় পাণ্ডিত্য আভিজাত্য ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগ করে এখন শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর। যতদিন এই নশ্বর শরীরের নাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করতে থাক, জন্মে জন্মে এই নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে কায়-মন-বাক্য অর্থাদি দ্বারা নিত্যকাল সেবা কর, তাঁহার সেবা করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা আদির শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ কর, সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার সেবা কর। সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জেনে, তাহাদিগকে আদর পূর্ব্বক কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত কর।

মহাপ্রভুর এই মঙ্গলময় উপদেশে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সর্বাত্মার আত্মা—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিখিল জীবের একমাত্র ভজনীয় সেবনীয় আরাধনীয়-পূজনীয় বন্দনীয়-স্মরণীয়-স্তবনীয় ও নিত্যকালের প্রেমাস্পদ-বান্ধব। শ্রীকৃষ্ণ "নিত্যসেব্য", জীব "নিত্যসেবক", কৃষ্ণ "ভোক্তা" 'জীব-ভোগ্য", কৃষ্ণ "মায়াধীশ" জীব "মায়া-বশ" যোগ্য, কৃষ্ণ কুণ্ঠাতীত" জীব "কুণ্ঠাযুক্ত", কৃষ্ণ "অনন্তশক্তিমান" জীব, "অনু-শক্তিমান", কৃষ্ণ"পরমস্বতন্ত্র" জীব "পরতন্ত্র", কৃষ্ণ একস্থানে থাকিয়াও "সর্বগ"—জীব "একস্থানে স্থিত হয়ে অন্যত্র গমনে অসমর্থ", কৃষ্ণ "সর্বজ্ঞ"—জীব "অসর্ব্বজ্ঞ", কৃষ্ণ "বিপরীত ধর্মী অসীম অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত"—জীব ক্ষুদ্র সসীম শক্তিযুক্ত, কৃষ্ণ "ষোলকলা পরিপূর্ণ তত্ত্ব"—জীব "বিভিন্নাংশ অপূর্ণ তত্ত্ব"। এবংবিধ পরতত্ত্ব "শ্রীকৃষ্ণ" (শ্রী + কৃষ্ণ) স্বরূপশক্তি-শ্রীরাধাসহ কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলারস দ্বারা সর্ব্বজীবজগতকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে রেখেছেন। তাঁহার বদন-কমল-নয়ন-কমল, বক্ষকমল, হস্তকমল, চরণ কমল—সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত হলেও তাঁহার "শ্রীচরণ" কমল বড়ই উদার, তাঁহার এই চরণকমলের সেবা নিম্নাধিকারীগণও দাস্যভাবে করিবার সৌভাগ্য পাইতে পারেন, তাই মহাপ্রভু শ্রীকেশব পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবার নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ "গিয়া" ভজহ সকাল।

এই বাণীর মধ্যে "গিয়া" শব্দ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রকৃত আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তি "গৃহে বা বনে গিয়া"—গৃহস্থ আশ্রমে বা সন্ন্যাস আশ্রমে গিয়া অর্থাৎ যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে পারেন।

"গৃহে বা বনে থাক! হা গৌরাঙ্গবলে ডাক"।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ গিয়া "ভজহ সকাল" এখানে "ভজহ" শব্দে "সেবহ" অর্থাৎ সেবা কর। সর্ব্বজীবের পরমসেব্য হচ্ছেন, "শ্রীকৃষ্ণ"। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করাকেই "সেবা" বা ভক্তি বলে।

"সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

এইজন্য মহাপ্রভু সেই কেশব পণ্ডিতকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণভজন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন, তখন ঐ পণ্ডিত বহির্মুখ সঙ্গ পরিত্যাগ নিরভিমানে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ "সকাল"।

এখানে "সকাল" শব্দের অর্থ "কালবিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর।" মহাপ্রভু ঐ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বল্লেন,—

"তুমি এখন এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময়টী আর বৃথা ব্যয় করো না,—অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণচরণকমল ভজন করতে আরম্ভ কর, কারণ জীবের জীবন—"কমলদল" জলবৎ ক্ষণস্থায়ী, কখন ইহা পতন হবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই,—তাহাতে আবার প্রতিমুহূর্ত্তে বিবিধ বাধাবিপত্তি আসিয়াজীবনকে প্রতিহত করিতে থাকে।' এ বিষয়ে মহাপ্রভুর একজন—প্রিয়পার্ষদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতাবলিতে বলেছেন—

এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,

এবে না ভজিলে যশোদাসুত,
চরমে পড়িবে লাজে ॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই
না ভজহ হৃদয়রাজে ।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥
কৃষ্ণনাম সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন মাঝে ॥

বলেছেন—

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই ।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ।"

ভাঃ ১১।৯।২৯

এই মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ, বহু যোনি ভ্রমণ করার পরে বহু সুকৃতি ফলে এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, অথচ ইহা অনিত্য—অধিক দিন স্থায়ী থাকে না, কিন্তু এই মানুষ জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে একমাত্র এই জীবনেই পরমার্থ লাভ করা যেতে পারে, অন্য কোনো জন্মতে-নরোত্তম শরীরের সাক্ষাৎ ভাবে কৃষ্ণ ভজনের সুযোগ হয় না, বিষয়-ভোগাদি সর্ব জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনের সুযোগ মনুষ্য শরীর ছাড়া অন্য শরীরে হয় না।" "জনমে জনমে সবে পিতামাতা পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়।" "নরতনু ভজনের মূল" তাই ভজন চতুর ভক্তগণ এই দুর্লভ জীবনের এক মুহূর্তকালও বৃথা নষ্ট করেন না, যতদিন পর্যন্ত শরীরে প্রাণ থাকে, ততদিন পর্যন্ত পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন।

মহাপ্রভু শ্রীকেশব পণ্ডিতকে কৃষ্ণ ভজনোপদেশ দিবার পূর্বে জঞ্জালরূপ অনর্থসমূহকে পরিত্যাগ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন, ইহা সাধকগণের পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়—

মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।
এতেকে মহান্তসব সর্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি'।
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল। (চৈ ভা আ ১৩।১৭৪-১৭৬)

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান কতদিন করতে হবে এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট ফল কি তাহাও মহাপ্রভু বলিতেছেন—

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়'॥ (চৈ ভা আ ১৩।১৭৭-১৭৮

ভগবৎ ভজনকারী সাধককে ভক্তি প্রতিকূল জঞ্জালসমূহ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত, উচ্চকুলে জন্মলাভ, প্রচুর ধনলাভ, উচ্চ শিক্ষালাভ সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া যদি মনুষ্য ভগবৎ ভজন না করে তবে ঐগুলি তাহার পক্ষে মহা জঞ্জালের কারণ হয়, "লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা" জড়েন্দ্রিয় তর্পণবাঞ্ছা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী অনর্থসমূহ সাধকের পক্ষে মহাজঞ্জাল, তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন—

ধন-যৌবন-জীবন রাজ্য সুখং ন হি নিত্যমনুক্ষণনাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথাসকলং বিফলং ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্॥
রমণীজনসঙ্গ-সুখঞ্চ সখে চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতির্ভজ গোদ্রুম কাননকুঞ্জবিধুম্॥

"পরনিন্দা"-"পরচর্চ্চা" করা---সাধকের পক্ষে একটা মহাঅমঙ্গলকর-জঞ্জাল। দোষীব্যক্তির দোষচর্চ্চা করতে করতেই ঐ দোষগুলি প্রায়ই ঐ চর্চ্চকের উপরেই আসিয়া পড়ে, এইজন্য উহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করা সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য মক্ষিকাগণ যেমন অপরের পচা ঘা এবং কোথায় বিষ্ঠা, দুর্গন্ধ বস্তু তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকে, পরনিন্দুকগণও সেইরূপ অপরের শুধু দোষ অনুসন্ধান পূর্বক নিন্দা সমালোচনা করিতে থাকে, অপরের কোন গুণ তাদের চোখে পড়ে না, নিজেদের শত শত সহস্র দোষ থাকা সত্বেও উহা সংশোধন করিতে কোন চেষ্টাও করে না, উহারা পরের দোষানুষ্ধান করিতে করিতে শেষে সর্ব গুণে গুণী ভগবৎ ভক্তকেও নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এমনকি সর্ব্বপূজ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেও নিন্দা করিতে ছাড়ে না, তাই পরিশেষে উহারা অপরাধ মাথায় করিয়া অনন্ত-কাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তাই মঙ্গল প্রার্থী সাধকগণ, পরনিন্দাদি

পরিত্যাগ করে নিরন্তর প্রীতিপূর্ব্বক-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-করিয়াই অজয় শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করে।

কাহারো না করে নিন্দা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে।
অজেয়চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥

প্রকৃতভজনকারী ভক্তগণ অদোষ দর্শী, কাহারও দোষ দর্শন করে না কেবল অপরের গুণই দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহারা কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না, নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রত থাকেন—অপরের নিন্দা সমালোচনা করার সময় তাঁদের কোথায়।

অনিন্দুক হই যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিবে হেলে॥

তাই করুণাময় মহাপ্রভু কৃপাপ্রার্থী শরণাগত শ্রীকেশব পণ্ডিতকে ভক্তি, প্রতিকূল যাবতীয় অনর্থরূপ জঞ্জাল পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিলেন।

এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥

তখন ঐ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম হিতোপদেশ শ্রবন পূর্বক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকেই একমাত্র পরমবান্ধব বলিয়া অবগত হইতে পারিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ সেবাই জীবনের একমাত্র কৃত্য বলে জানতে পারিলেন, তখন তাঁহার জড়ীয় বৈভবাদিতে বৈরাগ্যের উদয় হইল; হস্তী ঘোড়া ধনাদি সমুদয়কে তিনি অন্য লোকদিগকে বিতরণ করে দিলেন, তাহার পাণ্ডিত্যের অহংকার ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল তিনি তৃণাদপি সুনীচ হয়ে নিষ্কিঞ্চন বেশে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে অন্যত্র গমন করিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্র দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥

কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইল বিপ্র নম্র॥
হস্তীঘোড়া দোলাধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্বস্ব আপনার।
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।

(চৈঃ ভাঃ আ ১১।১৮৭-১৯০)

মহাপ্রভুর পরম হিতকর বাণী শ্রবণ করে শ্রীকেশব পণ্ডিতের ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, তিনি যেরূপভাবে অকিঞ্চনভাবে বেশ গ্রহণপূর্বক ভগবৎ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমি যেন তাহার অনুসরণ করে, ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ-কমল সেবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি—ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে পরাশান্তি লাভ

তত্ত্বদর্শী ভগবৎপার্ষদগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্বসার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ প্রতীতিতে তিনি প্রকাশিত। 'ব্রহ্ম' তাঁহার জ্যোতি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ এবং ভগবান 'নারায়ণ' তাহার বিলাস—শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ং ভগবান্' অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বসার

'রাম', 'নৃসিংহ', 'বরাহ', 'বামন', আদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা। অবতারগণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে এজগতে অবতীর্ণ হন। আবার

কখনও কোন বিশেষ যুগে অবতারী নিত্য গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-বিনোদন এবং প্রেমাস্বাদন করার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

(১) প্রেমরস—নির্যাস করিতে আস্বাদন।
(২) রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু ইচ্ছার উদ্গম॥

সর্বাবতারের মূল শ্রীকৃষ্ণই মৎস কূর্মাদি অংশকলা অবতাররূপ ধারণ করেন।

"কেশব ধৃত "মীন" শরীর, জয় জগদীশ হরে॥
কেশব ধৃত "কূর্ম" শরীর জয় জগদীশ হরে॥
কেশব ধৃত "শূকর" রূপ জয় জগদীশ হরে॥
কেশব ধৃত "নরহরি" রূপ জয় জগদীশ হরে॥
ইত্যাদি ইত্যাদি॥

এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃঢ়য়ন্তি যুগে যুগে॥

জীবের স্বরূপ

জীবসমূহ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস।
জীবের "স্বরূপ" হয়,—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি 'ভেদাভেদ প্রকাশ'॥"

চিন্ময়সূর্য সদৃশ ভগবানের কিরণ পরমাণুরূপ জীবসমূহ। অনুত্ব নিবন্ধন ও তটস্থ ভূমিকায় অবস্থিত বলিয়া জীবের মায়াবশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে। 'ভগবৎ বিস্মৃতিই' মায়াবশীভূত হইবার কারণ।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥

মায়াবদ্ধজীব আপন আপন কর্মানুসারে অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপে জর্জরিত হইতেছে। কখন স্বর্গে দেবতারূপে দৈত্য ভয়ে ভীত হইতেছে, আবার কখন এই বিশ্বে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গরূপে বিবিধ কর্মচক্রে নিষ্পেষিত হইতেছে ; অথচ এই নিষ্পেষণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার যোগ্যতাও জীবের নাই। এইপ্রকারে চৌরাশীলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে কোন জীবের যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখন সাধুগুরুর কৃপায় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ সেবন ধর্ম আচরণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, তাঁহার সেবা করাই জীবের স্বধর্ম।

সাধুসঙ্গ লাভই কৃষ্ণকৃপার নিদর্শন

পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপার নিদর্শন—'সাধুসঙ্গ লাভ'। কোন জীবের প্রতি ভগবান্ যখন অহৈতুকী কৃপা করেন, তখন তাহাকে সাধুসঙ্গ প্রদান করেন। সাধু বা শ্রীগুরুদেব তাহাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

শ্রীকৃষ্ণ জীবস্বরূপের নিত্য প্রভু এবং জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস ; 'প্রভু' ও 'দাস'—এই সম্বন্ধটী হওয়ায় 'প্রভুর সেবাই' শুদ্ধ জীবাত্মার 'নিত্যধর্ম।' 'সেব্য', 'সেবক' ও 'সেবা',—ভক্তিমার্গে এই তিনটির ধ্বংস বা বিনাশ কখন হয় না। প্রভুর সেবা ছাড়া জীবস্বরূপে 'কর্তৃত্ব', 'ভোক্তৃত্ব' কখনও থাকে না। 'দাস' অভিমানেই সর্ব্বদা তিনি প্রভুর সংসারের যাবতীয় সেবা সম্পাদন করেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় সম্ভোক্তা। তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জীব ও জড় পদার্থের সত্ত্বাধিকার একমাত্র তাঁহারই। তিনিই 'কর্ত্তুমকর্ত্তুম্ অন্যথাকর্ত্তুং সমর্থ।" তাঁহার দ্রব্য তিনি নিজে ভোগ করিলে কোনই অন্যায় হয় না।

কৃষ্ণসুখের জন্য অখিল চেষ্টাই কৃষ্ণসেবা

শ্রীকৃষ্ণের নিজজন শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীবের 'কৃষ্ণসেবা' লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব ভগবানের নাম ও মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিয়া শ্রীভগবৎবিগ্রহের সেবা প্রদান করেন। ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করা, শ্রীবিগ্রহের পরিচর্য্যা-পূজন ও বন্দন করা, তাঁহার দাস্যাভিমানে সেবা করা, প্রিয়ত্ববোধে সখার ন্যায় পরিচর্য্যা করা এবং 'কায়মনবাক্য—সর্বস্ব' ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পণ করাকেই ভক্তি বলে। এই নবধা ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণ সেবা হয়। সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ভগবৎ নামানুশীলন বা নামসংকীর্ত্তন করাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ সাধন বলে।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।"

বিষয়সুখের জন্য জীব যে প্রকার চেষ্টা করে, সেই প্রকার কৃষ্ণসেবার জন্য যদি চেষ্টা করে, তবে তাহার কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভ অবশ্য হয়। লৌকিকী বা বৈদিকী সমস্ত কর্ম কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে কৃত হইলে তাহাও ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। অন্যাভিলাষতা শূন্য হইয়া, জ্ঞান কর্মের আবরণ পরিত্যাগ পূর্বক সেবার অনুকূলতার সহিত সর্বেন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলন করিলে উত্তমা বা বিশুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং ঐ শুদ্ধভক্তি হইতেই জীবের পুরুষার্থ শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হয়। উহাই জীবের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বা প্রয়োজন।

কৃষ্ণেচ্ছায় সাধুসঙ্গফলে মায়াজয়

ভগবৎ কৃপায় যখন জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং সাধুকৃপা যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে পারে, তখন তাঁহার প্রথমেই শ্রীভগবানের নিজজন

বৈষ্ণবের সঙ্গে আসক্তি, মায়িক দেহ-গেহ সম্পর্কে অনাসক্তি, অজ্ঞ নিরীহ জীব-সমূহের প্রতি দয়া, সমজাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা উন্নত অধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবের সেবা করিবার বৃত্তির উদয়।

অখিল সদ্‌গুণসমূহ তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে, শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও শোক প্রকাশ করেন না বা ধন-পুত্রাদি লাভ হইলেও তিনি সুখে মজ্‌গুল হন না। বিশ্বের সর্বত্রই বিষ্ণু ওতঃপ্রোতভাবে বর্তমান আছেন। সর্বত্র তাহারই প্রকাশ অনুভব হয়, ভোজন আচ্ছাদনাদিতে যথা লাভে সন্তোষ থাকেন। নাটক, উপন্যাস, এমনকি তথা কথিত ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেও তাঁর রুচি থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি ভগবৎ প্রতিপাদিত শাস্ত্র-সমূহ শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া তিনি ইতর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হন। তিনি চক্ষুকে ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শনে, কর্ণকে শ্রীহরির অত্যদ্ভুত চরিত এবং অসুর-দলন ভক্ত বাৎসল্যাদি লীলাকথা শ্রবণে, নাসিকাকে ভগবৎ নির্মাল্য আঘ্রাণে, জিহ্বাকে ভগবৎ গুণকীর্তনে ও প্রসাদ সেবনে, ত্বক্‌কে ভক্ত ও ভগবানের চরণ সেবায় নিযুক্ত করেন , তিনি তাঁহার সর্বেন্দ্রিয়কে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিবার অখিল চেষ্টা ও যত্ন করেন। ভগবৎ প্রীত্যর্থে যজ্ঞ, দান, ব্রত আদি সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। স্বীয় অনুগত প্রিয়জনকেও ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। তিনি ভগবৎ সেবা অপেক্ষাও তদীয় নিজজন ভক্তের পরিচর্য্যা বিশেষ আদরের সহিত করেন। "আমা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়",—এই ভগবৎ বাণী তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভক্তমুখে পরম পাবন ভগবৎ-যশরাশির কথা অনুক্ষণ শ্রবণ করিতে করিতে এবং ভক্তসঙ্গে ভগবৎ সেবার অনুশীলন করিতে করিতে দুর্জ্জয়া মায়াকে অনায়াসে জয় লাভ করিতে পারেন।

পরাশান্তি লাভ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিয়ামকত্বে ঐ ব্যক্তি নিরন্তর ভগবৎ সেবা করিতে করিতে পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হন এবং অন্যের হৃদয়েও ভগবৎ স্মৃতি উদ্দীপন করাইয়া উহাকেও কৃতার্থ করিতে পারেন। তখন আর তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না। তাঁহার লোকলজ্জা বিদূরিত হয়, অধিকন্তু কৃষ্ণসেবা চিন্তায় বিভোর থাকিয়া অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-

কার লাভ করেন এবং অনুক্ষণ পরমানন্দ বা পরাশান্তি অনুভব করিয়া ধন্য হন। বিবিধ দুঃখপূর্ণ এই বিশ্বও তাঁহার নিকট তখন "পূর্ণং সুখায়তে" বলিয়া অনুভব হয়।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ বশীকরী সেবাই জীবের আনন্দ অবধি

ভগবৎ সৃষ্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবসমূহকে মনিষীগণ স্থাবর জঙ্গমরূপে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তৃণ-গুল্ম-লতা-আদি যে সমস্ত প্রাণী একস্থানে অবস্থান করে তাহাদিগকে "স্থাবর প্রাণী" বলে। আর যারা গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে জঙ্গম প্রাণী বলে। জঙ্গম প্রাণী জলচর, স্থলচর, খেচর এই তিনভাগে বিভক্ত। এই ত্রিবিধ প্রাণীর মধ্যে স্থলচর প্রাণীর সংখ্যা কম। তাহার মধ্যে মনুষ্য জাতি আরও অল্পতর এই মনুষ্যের মধ্যে অধার্মিক পাপাচারী নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক।

জীবের প্রাপ্য বস্তু "আনন্দ"

জীব মাত্রই আনন্দ চায়। এই আনন্দ লাভের জন্য জীবসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া পাপ বা পুণ্য কর্ম করিয়া থাকে। কোন্ কর্মের দ্বারা প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা উহারা পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারে না। কখন কখন আনন্দ প্রাপ্তির বদলে নিরানন্দ বা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনন্তজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্ম মনুষ্যের ক্রমবর্দ্ধন আনন্দের দিক দর্শন বর্ণিত হইতেছে।

নিরীশ্বর অনৈতিক

মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক এই আনন্দ উপভোগের জন্য অপর মনুষ্যাদি প্রাণীর প্রতি অত্যাচারপূর্বক তাদের ধন, জন প্রাণ, আদি বিনাশ

করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরের দুঃখকষ্টে তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দুঃখের উদয় হয় না। বরং উহাতে তাদের উল্লাস বর্দ্ধনই হইয়া থাকে। উহারা বন্য পশুর ন্যায় কেবল আহার শৃঙ্গারাদিতে প্রমত্ত থাকিতে চায়। উহাদিগকে শাস্ত্রে বলেছেন "ধর্মেণ হীনা পশুভি সমানাঃ" মহাজনগণ উহাদিগকে নিরীশ্বরত অনৈতিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

নিরীশ্বর নৈতিক

নিরীশ্বর নৈতিক নামে আর এক শ্রেণীর লোক আছে। উহারা নাস্তিক হলেও সামাজিক নীতি রাষ্ট্রীয় নীতি স্বীকার করেন। তাহারা পরস্পরের সুখ সুবিধা পাইবার জন্য গোষ্ঠীগতভাবে একস্থানে সমাজ সংগঠনপূর্বক বাস করিয়া থাকেন। তাহারা সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ তথা কথিত বর্ণাশ্রমের বিধি পালনপূর্বক কৃষিকার্য্য, ব্যবসা, রাজ্যশাসন, রাজ্যপালনাদি করিয়া দেশের-দশের, জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবের, সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতসাধন করিয়া থাকেন। উহারা দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষানিকেতন, হাসপাতাল স্থাপন, শত্রুপক্ষ হইতে দেশকে রক্ষা, খাদ্য ও অর্থের উন্নতি সাধন, সমাজ সংস্করণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যসমূহ করিয়া আনন্দ পেতে চান, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা থাকায় ভক্ত-সমাজ ইহাদিগকে বহুমানন করেন না। পশু পক্ষী বা নিরীশ্বর অনৈতিক পুরুষ হইতে উহারা উত্তম হলেও শাস্ত্রমহাজনগণ উহাদের চেষ্টা সমূহকে প্রশংসা করেন না, বরং গর্হনই করিয়া থাকেন।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্॥

ভাঃ—১।২।৮

বর্ণাশ্রমধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি বিষ্ণু বৈষ্ণবের কথায় বা সেবায় রতি না হয় তবে উহাদের যাবতীয় চেষ্টা কেবল পরিশ্রমেই পর্যবসিত হয়।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

কল্পিত সেশ্বর নৈতিক বা কর্মকাণ্ডীজন

ঐ নিরীশ্বর নৈতিক মনুষ্যগণ হইতে বেদানুগ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ, তবে ইহাদের মধ্যে অনেকে "বেদ" শুধু মুখেই স্বীকার করেন। কার্য্যতঃ বেদ নিষিদ্ধ পাপেই মত্ত থাকেন। বস্তুতঃ বৈদিক বিধানানুসারে কার্য্য করেন না। যাহারা স্বসুখ কামনা মূলে কোন দেবতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের গন্তব্যস্থান স্বর্গাদি ক্ষয়িষ্ণুলোক। ইহাদিগকে "কল্পিত সেশ্বর নৈতিক" বলে।

কাংখন্তং কর্মণাং সিদ্ধি যজন্ত ইহ দেবতা।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি।

উহারা দেবতা স্বজনাদি পুণ্য কর্মদ্বারা আপাততঃ আনন্দ কর স্বর্গাদিলোকে গমন করিলেও পুণ্য ক্ষয়ান্তে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বাস্তব সেশ্বর নৈতিক

এই কর্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ অপেক্ষা পরতত্ত্বে বিশ্বাসী বর্ণাশ্রমীগণ শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহারা জানেন বিষ্ণুই মনুষ্যের গুণ কর্মের বিচারপূর্বক এই বর্ণাশ্রম ধর্ম স্জন করিয়াছেন। তাই বর্ণাশ্রমীগণ বিষ্ণুর সন্তোষের জন্য নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্মসমূহ পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষ্ণুছাড়া অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করেন না, বা ভক্তিমার্গ ভিন্ন কর্মজ্ঞান যোগাদি মার্গের সাধন করেন না। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলেই তাঁহাদের পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, শাস্ত্রে বলেছেন—বিষ্ণু পুরাণঃ—৩৮।৯

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেন পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

গৌর পার্ষদবর শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সাধ্য নির্ণয়ক" প্রশ্নের উত্তরে সর্ব প্রথমেই এই বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্মদ্বারা বিষ্ণুর সন্তোষ বিধানের কথা জানাইয়াছেন। যদিও ইহা সাধ্য নির্ণয়ের বাহ্যিক কথা, তথাপি ইহা পরমার্থ জীবনের মূল ভিত্তি স্থানীয়। কারণ এই বর্ণাশ্রমীগণ একমাত্র বিষ্ণুকেই কেন্দ্র করিয়া স্বসুখ কামনার্থে আপন আপন ভূমিকাতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম পালন করেন; কৃষ্ণেতর দেবগণের উপাসনা করেন না। শ্রীমদ্-ভাগবতে বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে লক্ষ্য করে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেছেন—

অতঃ পুংভি দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিঃ হরিতোষণম্ ॥

শ্রীভাঃ ১।২।১৩

শ্রীহরির সুখ বিধানই বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের সুষ্ঠুফল।

কর্মার্পণ

বর্ণাশ্রমীগণ বিষ্ণুর সন্তোষের জন্য ও আশ্রম ধর্ম পালন করিলেও উহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানের কর্ম করেন। উহাদের কৃত কর্মফল পরতত্ত্বের সবিশেষ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

(গী ৯।২৭)

তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যায় লাগাও, তাহা আমাকে (কৃষ্ণে) অর্পিত কর।" সাধকগণ কর্তৃত্বাভিমানে কর্ম করিয়া ভগবানে অর্পণ করিলে ঐ কর্ম ভক্তির সহিত মিশ্রণ হওয়ায় উহাই "কর্মমিশ্রা" ভক্তি নামে অভিহিত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন অপেক্ষা "কর্ম্মার্পণ" উত্তম হইলেও মহাপ্রভু ইহাকেও সাধ্য নির্ণয় বিষয়ে বাহ্য লক্ষণই বলিয়াছেন। কারণ যতদিন কর্মফলের সঙ্গে নিজেকে ভগবৎ চরণে অর্পণ না করা যায়, ততদিন ঐ কর্মমিশ্রা ভক্তি যাজনকারীকে ভগবান আত্মসাৎ করেন না। বলিমহারাজ নিজেকে দাতা ও কর্ত্তা অভিমান করে শ্রীবামনদেবকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল দান করেছিলেন, ভগবান বামনদেব তাহাতে ও সুখী হইতে পারেন নাই, যখন বলিমহারাজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিলেন, তখন ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীবলিমহারাজের প্রতি প্রশন্ন হইয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন এবং নিজে ভূতলে তাঁহার দ্বারের প্রহরী রূপে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্বধর্মত্যাগ পূর্বকশরনাগতি

এইজন্য কর্মাপন হইতে কর্মফল ত্যাগ পূর্বক ভগবৎ চরণে শরণাগত হওয়াই শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের দৈহিক পারিবারিক সামাজিক সুখময় জীবন ধারণের জন্য ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে যে সমস্ত সদুপদেশ প্রদান করেছেন তাহার গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক যাহা উহা সম্পুর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ পূর্বক তাঁহার ভজন করেন, তাঁহারা কর্মার্পণকারী ভক্ত হইতে অধিক উন্নতি সেবার অনুরোধে উহারা বর্ণও আশ্রম ধর্মের বিধিসমূহ পালন করিতে না পারিলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে অবশ্য উদ্ধার করিয়া থাকেন; ভগবান বলিয়াছেন—

মন্নিমিত্তকৃতং পাপমপি পুন্যায় কল্পতে।
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ,

শরণাগত ভক্তের যতদিন স্বাভাবিকভাবে ভগবৎ সেবন বৃত্তির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত পদবীতে অভিহিত করা যায় না, এইজন্য মহাপ্রভু কর্মফল পরিত্যাগী সেবাহীন কেবল শরণাগত জনকে" বহু মানন করেন নাই তাঁহাদের ঐ-প্রকার ভক্তিকেও শুদ্ধাভক্তি বলে স্বীকার করেন নাই।

ঐ কর্মমিশ্রাভক্তি হইতে জড় নির্বিশেষ জ্ঞানাবৃত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী আত্মারাম পুরুষগণ জড় চিন্তা রহিত হইয়া নিরন্তর আত্মানন্দে মত্ত থাকেন, তাঁহারা প্রাপ্ত বস্তর বিনাশ শোক করেন না বা অপ্রাপ্য বস্তুপাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মময় জগৎ দর্শন করেন এইরূপ শুদ্ধ চিত্ত আত্মারামীগণ যদি দৈবাৎ (ভাগ্যক্রমে) কোন বিশুদ্ধ ভক্ত মহাজনের সঙ্গ প্রাপ্ত হন তবে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভের সৌভাগ্য হয় ব্রহ্মানন্দী শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু যখন পরম ভাগবত শ্রীব্যাসদেব জীর শ্রীমুখে উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের বিমল যশগাথা শ্রবন করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তা বিদূরিত হওয়ায় তিনি বৈষ্ণব মুকুটমনি পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিলেনঃ—

ব্রহ্মাভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংখতি'
সম সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"

গীতা (১৮।৫৪)

জ্ঞানশূন্য ভক্তি

এই জ্ঞানমিশ্রাভক্তিতে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের সেবন ধর্ম না থাকায় মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য লক্ষণ বলেছেন জ্ঞানশূন্য ভক্তিতে জড় নিরসন ও নির্বিশেষ ব্রহ্মানুশীলন প্রবৃত্তি থাকে না। এই ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে সাধকগণ যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ বিগলিত হরিকথামৃত পান করিতে করিতে কায়মন বাক্যে নিরন্তর হরিসেবাময় জীবন যাপন করেন,

তাঁহাদের অন্যকোন কামনা বাসনা থাকে না তাঁহারা কর্মের আবরণে বা জ্ঞানের আবরণে ভক্তি যাজন করেন না, কেবল কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী সেবা দ্বারা ই জীবন ধারণ করেন, ইহাকেও "শুদ্ধাভক্তি "বা "সাধন ভক্তি" বলে, "শ্রদ্ধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "সাধুসঙ্গ" "ভজন ক্রিয়া" "অনর্থ নিবৃত্তি" "নিষ্ঠা" "রুচি" "আসক্তি" এই পর্যন্ত এই বৈধ সাধন ভক্তির গতি, এই ভক্তির ভূমিকায় পৌছিতে সাধকগণকে বহু বহু জন্ম পর্য্যন্ত ঐকান্তিক ভাবে সাধন করিতে হয়।

প্রেমভক্তি

ঐ সাধন ভক্তির উন্নতি ভূমিকাই "প্রেমভক্তি" ইহা রাগানুগ ভক্তিতেই লভ্য হয়। সুকৃতি জনিত বৈধীভক্তি দ্বারা ইহা লভ্য নহে 'প্রেম" ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া "স্নেহ" "মান" "প্রণয়" "রাগ" "অনুরাগ" ' ভাব" "মহাভাব" পর্য্যন্ত গিয়া স্থিতি প্রাপ্ত হয়, শান্ত রসে রতি বৃদ্ধি পাইয়া প্রেম পর্য্যন্ত সীমালাভ করে, "শান্তরসে" দাস্য রসের ন্যায় ইষ্টে মমতা না থাকায় ইহাতে সেবন ধর্ম দৃষ্টি হয় না, এই জন্য ইহা অপেক্ষা দাস্য প্রেম অধিক উত্তম।

দাসরূপে গৌরব বুদ্ধি প্রবল থাকায় এই প্রেমে গাঢ়তার কিছু অভাব থাকে, দাস্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট সর্বৈশ্বর্য্য করতল গত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাহাদের সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ অনুভব করেন।

"যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে"

(ভাঃ ১।৫।১৩)

সখ্যপ্রেম

সখ্যরসে "বিশ্রম্ভভাবে" সেবন বৃত্তি থাকায় সম্ভ্রম যুক্ত দাস্য-প্রেম হইতে ইহার মাহাত্ম্য আরো অধিক। সখ্য রসের রতি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ

পর্য্যন্ত বাড়ে "সখা শুদ্ধ সখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম" সখার এই বাক্যে ভগবান্ খুব সুখী হন।

বাৎসল্য প্রেম

বাৎসল্যে রসে ইষ্টের প্রতি স্নেহাধিক থাকায় সখ্যপ্রেম হইতে ইহা আরো উত্তম. বাৎসল্য রতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত যায়। এই রসের ভক্তগণের ইষ্টের প্রতি গৌরব বুদ্ধি ও সমবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া নিজেকে "পালক" "শাসক" "রক্ষক" অভিমান আনয়ন করে ; ইহা দেখিয়া কৃষ্ণের খুব আনন্দ হয়।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন ও পালন॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৪)

কান্তাপ্রেম

কান্তা প্রেমে "সংকোচ শূন্য প্রীতি" থাকায় উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম,। এই রসে শান্ত প্রেমের "নিষ্ঠা" দাস্ত প্রেমের "গৌরব শূন্য সেবন" বাৎসল্য প্রেমের "স্নেহাধিক ভাব" ত আছেই, অধিকন্তু ইহাতে সংকোচশূন্য প্রীতি থাকায় ইহা **সর্বসাধ্যসার** রূপে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন।
বেদ স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন

শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেম

শ্রীরাধিকা সর্বকান্তা শিরোমণি ; তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি করেন। শতকোটী গোপীগণকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতে ছিলেন, সেই সময় প্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাস মঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন বিরহিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অধিক ভালবাসেন, তাই আমাদিগকে পরিত্যাগ করে তাঁহাকে নিয়েই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

আর এই সময়ে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিয়া রাস মঞ্চ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিষন্ন চিত্তে অপর গোপীদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরাধার অন্বেষণার্থে বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন।

কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধশৃংখলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥
শতকোটী গোপী মাঝেতে হরি,
রাধা সহ নাচে আনন্দ করি ॥
মাধব মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত চিত"

* * *

মেহিয়া বরজ কিশোর মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন॥
শতকোটী গোপী মাধব মন।
রাখিতে নারিল করি যতন॥
বেণু গীতে ডাকে "রাধিকা" নাম।
"এস, এস, রাধে" ডাকয়ে শ্যাম॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাসমণ্ডল তবে।
রাধা অন্বেষণে চলয়ে যবে॥

"দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ।"
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান।
নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি।
বলে তুহু বিনা কাহার রাস,।
তুহু লাগি মোর বরজ বাস॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব কান্তা শিরোমণি, শ্রীরাধিকার প্রেম সেবায় শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ বশীভূত হন, এরূপ আর কাহারো দ্বারা বশ হন না।

প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত

কান্তা প্রেমে "প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত" বলিয়া একটি অবস্থা আছে, উহা "সম্ভোগ" ও "বিপ্রলম্ভ" ভাবে বিবিধ। বিপ্রলম্ভ দশায় সম্ভোগের পুষ্টি হয় শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য কখন কখন তিনি তাহাদের চক্ষের অগোচরীভূত হন, সেই সময় বিপ্রলম্ভভাবে নিবিষ্ট চিত্ত" ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্ভোগ স্ফূর্তি লাভ করিয়া থাকেন, অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে সম্মুখে পুনরায় প্রকটিত হন, তখন তাঁহাদের যে দিব্য আনন্দের উদয় হয় তাহা অনুভব ছাড়া কেহই ভাষায় বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। এই প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত আনন্দ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ অবধি বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত প্রবর শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট অত্যন্ত উল্লাস ভরে ঘোষণা করেছেন, আনন্দ অনুসন্ধান করিতে করিতে ভাগ্যবান্ মনুষ্যগণ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ ভেদ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণ চরণ, কল্পবৃক্ষ আরোহণ করিতে না পারেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকৃত আনন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারেন না. প্রেমিক ভক্তগণ পরমানন্দকন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়পূর্ণ বশীকরী সেবা সম্পাদন

করিলে "দেহলী প্রদীপের ন্যায়" "ভক্ত ভগবান্ উভয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

কান্তাপ্রেম-পাইবার উপায়

অন্যান্য গোপীগণের প্রেম হইতে পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধার প্রেমই **"সর্ব্বসাধ্য শিরোমণি"** কোটী কোটী জন্ম সাধনের দ্বারাও কেহ কেহ কখনও এই কান্তা প্রেম লাভ করিতে পারে না, ব্রজগোপীগণের কৃপাতেই একমাত্র কান্তা প্রেম লাভ করা যাইতে পারে এবং রাসমণ্ডলে গমনের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে, এমনকি শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী গোপাগণের আনুগত্য না করায় রাসে যোগদান করিতে পারেন নাই, এইজন্য এই দুর্লভ প্রেম পাইবার একমাত্র উপায় ব্রজ গোপীগণের ঐকান্তিক আনুগত্য করা, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি,
সখী ভাবে যে তারে করে অনুগতি ।।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেইসাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮-২০৪-২০৫)

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেহে রাসে অধিকার পাইলেন না। যখন তাঁহারা গোপীদেহ ও তাঁহাদের ভাব প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণের অনুগত হইলেন, তখনই তাঁহারা রাসে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলেন।

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া।
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপী ভাব লইয়া॥

বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহ কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৩৩-৩৪)

এই কান্তাপ্রেম এ ভৌম প্রপঞ্চে সুদুর্ল্লভ হইলেও পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কান্তারসের পার্ষদগণকে প্রকটিত রাখিয়া পারকীয় রসের ভজন শিক্ষা বিস্তার করাইয়া থাকেন, সৌভাগ্যবান্ জনগণ তাঁহাদের ভাবে লোভযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত দেহ লাভ পূর্বক মধুর রসের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, অদ্যাপি শ্রীগৌরসুন্দরের পরকীয় রসের ভক্তগণ আচার্য্যগণ সেই রস আস্বাদন পূর্বক অপর ভক্তগণকে সেবানন্দ আস্বাদন করাইতেছেন ; ইহাই বড় আশার কথা, ইহাই বড় আনন্দের কথা এই পারকীয় রসের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট বশীভূত হয়ে পড়েন এবং ভক্তগণও তাঁহার সেবানন্দে বিভোর হওয়ায় অন্য কোন দিকে তাঁহাদের মন ধাবিত হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই সর্বদোষকর কলিযুগের মহান গুন

বর্ত্তমানকাল কলিযুগ। পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসাদ্বেষ, কলহ-লড়াই প্রভৃতি এই যুগবাসীর নৈসর্গিক স্বভাব। স্বার্থের জন্য পুত্র পিতাকে প্রতারণা করিতেছে, পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করিতেছে। ধর্মের নামে পারিবারিক সামাজিক লোক হিতকর যে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোক প্রতারণা মূলে স্বকীয় স্বার্থের জন্যই সম্পাদিত হইতেছে। এই যুগে—ধনবান ব্যক্তিই সকলের পূজ্য বলিয়া অভিমান করে বলবান ব্যক্তিই ন্যায়পরায়ণ নামে অভিহিত হয়, যৌনসম্বন্ধে অভিরুচিই স্ত্রীপুরুষের

প্রীতির কারণ, কপটতাই ব্যাবসায় উন্নতির হেতু, যজ্ঞসূত্র ধারাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বেশমাত্র ধারণ বর্ণাশ্রমের পরিচায়ক, অর্থাভাবেই ধার্মিকগণের পরাজয়, বাগ-বৈখরতাই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, দরিদ্র ব্যক্তিই অসাধু বলিয়া গণ্য, দাম্ভিক-ব্যক্তিই সাধু নামে পরিচিত, বাক্যে অঙ্গীকারই বিবাহের পরিচায়ক, স্নানাচারই পাপ মলিন চিত্ত-পুরুষ নিজেকে পবিত্র বোধ করে নিজের উপরে তুষ্টিকেই পুরুষার্থ বলে জানে, ধৃতষ্টাপূর্ণ বাক্যকেই সত্য বলে অনুভব করে স্ত্রী-পুত্র-পালনই দক্ষতার জ্ঞাপক, যশ লাভের জন্যই ধর্মের আবশ্যকতা, শক্তিমান ব্যক্তিই রাজা হইবার যোগ্য, রাজা প্রজারঞ্জনের পরিবর্ত্তে দস্যুর ন্যায় প্রজাগণের স্ত্রী-ধনাদি অপহরণে ব্যস্ত, মানবগণ অল্পায়ু অধর্মপরায়ণ, হিংসাপরায়ণ, মিথ্যাবাদী, অজিতেন্দ্রি এবং রোগশোকগ্রস্থ।

কলিযুগ সর্বদোষাকর হইলেও তাহার এক মহান গুণ আছে।

কলির্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন দ্বারাই এই যুগে সর্বসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত-হওয়া যায়।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরযুগে ভগবৎ---অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারা তৎসমুদয় ফল লাভ হইয়া থাকে।

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৬-৩৭)

এই কলিকালে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বযুগের সর্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয়। এইজন্য গুণগ্রাহী সারভাগী জনগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, সংসার পরিভ্রমণশীল বদ্ধজীবগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম মঙ্গল জনক আর কিছুই নাই, কারণ ইহা হইতেই যাবতীয় দুঃখের অবসান ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দরূপ পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

কলিযুগের যুগধর্ম "শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন" প্রবর্ত্তন করার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে ৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনের প্রণালী বিশ্বে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

"তৃনাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"
(শ্রীশিক্ষাষ্টক-৩)

হরিকীর্ত্তনকারী নিজেকে তৃণাপেক্ষা (১) সুনীচ বলিয়া জানিবে—অর্থাৎ ধনী-মানী-বিদ্বান-কুলীন প্রকৃতির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস অভিমান করিবে। বৃক্ষের ন্যায় (৩) সহিষ্ণু হইবে। বৃক্ষকে কাটিলেও সে যেমন প্রতিশোধ লইবায় চেষ্টা করে না, অধিকন্তু ঘাতককেনিজের ছায়া ও ফলদান করিতে বিরত হয় না, সেইরূপ কীর্ত্তনকারীর প্রতি বিদ্বেষীগণ নানাপ্রকার বিরোধাচরণ করিলেও তিনি প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা না করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে উহাদের মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন এবং নিজে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতে থাকেন। নিজে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা

পাওয়ার জন্য লালায়িত না হইয়া (৩) অমানী হইবেন সর্বজীবে ভগবৎ অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে যথাযোগ্য (৪) সম্মান প্রদান করিবেন। এই চারিটি গুণে গুণী ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার লাভের যোগ্য।

"দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন।
চারিগুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন॥"

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে ভক্তি বিঘ্নকারক দশবিধ নামাপরাধ বর্জনে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন না করিলে মুখ্য ফল "প্রেম ধন" পাওয়া যায় না। নিম্নে দশবিধ ভক্তিবাধক অপরাধের বিশ্লেষণ ও উহার প্রতিকারের উপায় প্রদর্শিত হইল—

১। সাধুনিন্দা সর্বপ্রধান অপরাধ। নামপরায়ণ সাধুর কৃপা প্রভাবেই শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ হয়। সেই সাধুগণের প্রতি কোন প্রকার অমর্যাদা হইলে নামকীর্ত্তনের প্রকৃষ্ট ফল প্রেমানন্দ লাভ হইতে পারে না, দৈবাৎ যদি নামপরায়ণ ভক্তের চরণে অপরাধ হইয়া যায় তবে দীনতার সহিত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবঠাকুর পরম দয়ালু, তিনি শরণাগতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে শুদ্ধ নাম কীর্ত্তনের যোগ্যতা প্রদান করেন।

২। শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করা দ্বিতীয় অপরাধ। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সর্বদেবগণের উপাস্যতত্ত্ব। উহারা প্রত্যেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এক একটি অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে নিয়মিত ভাবে আজ্ঞানুরূপ সেবা করিতেছেন, তুচ্ছ ফল কামী পুরুষগণ কামানুরূপ দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, দেবতা প্রসন্ন হইলে স্বীয় অধিকার অনুরূপ ফল প্রদান করিতে পারেন—অন্য কোন ফল প্রদান করিতে পারেন না, সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বফল দানে সমর্থ। সুতরাং সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্য দেবগণের পূজা না করিয়া একমাত্র সর্বদেবপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন,

তরুমূলে জল দিলে যেমন শাখাপল্লবের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে দেবগণ পরিতুষ্ট হন। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।"

দেবগণকে কৃষ্ণদাস জানিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে—উহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করিলে দেবগণও অসন্তুষ্ট হন এবং ভগবচ্চরণে মহা অপরাধের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ পাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিলে ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

৩। শ্রীগুরুদেবকে অমর্যাদা করিলে "গুর্বাবজ্ঞা রূপ তৃতীয় অপরাধ হয়, সর্বদেবময় শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ জন। ভগবৎ বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবগণকে তিনি কৃপা পূর্বক কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শিষ্য অজ্ঞাতবশতঃ ভগবচ্চরণে যদি কোন প্রকার অপরাধ করিয়া ফেলে, তবে গুরুদেব স্বীয় শিষ্যের অপরাধ ক্ষালনের জন্য কৃষ্ণ পাদপদ্মে আবেদন জ্ঞাপন করেন, তাহার প্রিয়জনের আবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐশিষ্যের অপরাধ ক্ষমা করিতে বাধ্য হন। এবংবিধ করুনাময় শ্রীগুরুদেবকে ঐ শিষ্য যদি দুর্বুদ্ধিবশতঃ অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উহাকে কখনই ক্ষমা করেন না। অধিকন্তু তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন। "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।" ভগবানের পূজা হইতে শ্রীগুরুদেবের পূজা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে গুরুপূজার বিধান জানাইয়াছেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।"

গুরুদেবের ব্যবহৃত শয্যা-আসন-পাদুকা প্রভৃতি গুরুদেবের ন্যায় পূজ্য। শ্রীগুরুদেবকে দর্শন মাত্রেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করা কর্ত্তব্য, এমনকি ভগবৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখেও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামের বিধান শাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিনা বিচারেই শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন করা উচিত। আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেই মহা অপরাধ হয়।

শ্রীগুরুদেবের পদধৌত জল, পদরজ ও উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবনের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দৈবাৎ যদি শ্রীগুরুদেবের কোন অপ্রিয়কর কর্ম শিষ্যের দ্বারা সংঘটিত হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে দীনতার সহিত শ্রীগুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা নিরন্তর করিতে হইবে। তখন শ্রীগুরুদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন এবং ঐ শিষ্যও গুর্ব্বজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

৪। শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দা—চতুর্থ অপরাধ। বেদানুগ শাস্ত্রসমূহ বিশুদ্ধ ভক্তিকেই শাস্ত্রের চরম শিক্ষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভক্তি জীবের অবিদ্যা সমূহকে বিনষ্ট করিয়া পরাবিদ্যারূপ প্রেমভক্তিকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

বেদ-বিরোধী মায়াবাদ আদি মতবাদে চিত্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে শাস্ত্রীয় সুশিক্ষার প্রতি অনাদর হয়। সেই কারণেই শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দারূপ অপরাধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে শ্রুতিশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া রসিকভক্ত কীর্ত্তিত চিত্তাকর্ষী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে হইবে এবং ভক্তগণ সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইতে হইবে।

৫। শ্রীহরিনামে 'অর্থবাদ' পঞ্চম অপরাধ। শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগা অপরাধীগণ মনে করে—সাধারণ লোককে নামের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য অতিরঞ্জিত করিয়া শাস্ত্রে নামের প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য পুণ্যকর্মে প্রবৃত্তি করাইবার জন্য শাস্ত্র যেমন উহার অবাস্তব ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়া থাকে— নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকেও এইরূপ মনে করে। বস্তুতঃ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত নামের মাহাত্ম্য সমস্তই বাস্তব সত্য এমনকি শাস্ত্রও নামের মহিমার অন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে সন্দেহকারী ব্যক্তিই 'অর্থবাদরূপ' অপরাধে অপরাধী। ঐ অপরাধী ব্যক্তি নিজ দুষ্কৃতি হইতে উদ্ধারের জন্য নাম-

তত্ত্ববেত্তা গুরুবৈষ্ণবের নিকট স্বীয় দোষ জ্ঞাপনপূর্ব্বক কাকুতি করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে উঁহারা তাহাকে ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।

৬। "শ্রীহরিনামে অর্থ কল্পনা"—ষষ্ঠ অপরাধ। 'হরি' শব্দে সর্বসন্তাপহারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। যাহারা হরিশব্দে জড়ীয় কোন শব্দ বা নিরাকার ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করে তাহারা ঐ অপরাধে অপরাধী। উহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে সচেলে গঙ্গাস্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ অপরাধী ব্যক্তি যদি নামতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবচরণে মিনতি পূর্ব্বক স্বীয় অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে দয়াল বৈষ্ণবঠাকুর প্রেমালিঙ্গন দ্বারা তাহাকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।

৭। শ্রীহরিনামের বলে পাপবুদ্ধি—সপ্তম অপরাধ। হরিনাম কীর্ত্তন প্রভাবে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় জানিয়া যদি কেহ পাপাচরণে রত থাকে এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকে, তবে সেই অপরাধী ব্যক্তি জন্মে জন্মে শোক-ভয়-মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। পুনরায় সে যদি পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নামের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে সদৈন্যে হরিকীর্ত্তন করিতে থাকে, তাহা হইলে উঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ বিদূরিত হইয়া যায় এবং চিত্ত-হারী হরি তাহার হৃদয় সিংহাসনে সুখে বিরাজ করিতে থাকেন। পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তাহাকে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না এবং তাহার হৃদয়ে আর কোন পাপ কামনার উদয় হইতে পারে না।

৮। অনন্ত শুভ কর্মের সহিত "শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকে তুল্যজ্ঞান"—অষ্টম অপরাধ। দান, ব্রত, যাগ, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্মফলে অনিত্য স্বর্গাদি সুখভোগ লাভ হয়; পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। আর কৃষ্ণ ভজন প্রভাবে চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণধামে নিত্য অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আবর্ত্তন করিতে হয় না। 'শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন"—সাধনকালে উপায় হইয়াও সিদ্ধিকালে উহাই "উপেয়" রূপে প্রতিভাত হয়,

অর্থাৎ নামভজনকারী সাধনকালে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন এবং সিদ্ধিকালেও ঐ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রেমানন্দপ্রদ নাম হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নাই জানিয়া ভক্তগণ শ্রীনামকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

প্রমাদবশতঃ অন্য শুভকর্মের সহিত 'নাম' কীর্ত্তনকে তুল্যবোধ করিয়া বসিলে নামপরায়ণ শুদ্ধভক্তের পদধূলি, পদজল ও অধরামৃত মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিলে এই অপরাধ হইতে নিস্তার লাভ হয়।

৯। "অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ" নবম অপরাধ। ভক্তি-ভক্ত ভগবানের বিরোধী ব্যক্তিকেই অশ্রদ্ধালু বলিয়া জানিতে হইবে। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম কৃত হয়।"—এইরূপ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে কৃষ্ণভজনোপদেশ করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শঠতা করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণনাম মন্ত্র লাভ করিতে চেষ্টা করে,—গুরুদেব তাহার কপটতা অবগত হইয়া তাহাকে মন্ত্রাদিদান করেন না, অধিকন্তু তাহার কপটতা আদি পরিত্যাগের উপদেশ প্রদানে কুশলতার সহিত শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করাইয়া তাহাকে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করেন। মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে পাপ হইতে নিবৃত্তি করাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে,—"তোরা আর না করিস পাপ।"
জগাই মাধাই বলে—"আর নারে বাপ।"

যদি গুরুদেব কোন ভক্তিবিরোধী শঠ ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিয়া থাকেন তবে বৈষ্ণব সমাজে তাহা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। নতুবা শিষ্যের দোষে গুরুদেবকেও অত্যন্ত কলঙ্কের ভাগী হইতে হয়।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও দেহাদিতে 'অহং মমভাব' পোষণ করা—দশম অপরাধ। ভগবৎ সম্বন্ধ-বিস্মৃত হওয়ায় মায়াবদ্ধজীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়। ভগবৎ শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় জড় বিষয় সঙ্গ পরিত্যাগ

করা সম্ভব হয়। নিষ্কপটে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে থাকিলে শীঘ্রই দেহাদিতে "অহং মমভাব" বিদূরিত হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্বক ঐকান্তিক শরণাগত হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অনতিকাল মধ্যেই "প্রেম মহাধন" লাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। এতাদৃশ পরম মঙ্গলনিদান কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়াও যদি প্রেমানন্দ লাভ না হয়; তবে বুঝিতে হইবে নাম সংকীর্ত্তন সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এইজন্য যাহাতে শুদ্ধনাম সংকীর্ত্তন হইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন।

"অপরাধ নাহি ছাড়ি নাম যদি লয়।
সহস্র সাধনে তার ভক্তি নাহি হয়॥
দশ অপরাধ ছাড়ি নামের গ্রহণে।
ইহাই নৈপুণ্য হয়— সাধন ভজনে॥
অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়।
দশ অপরাধ ছাড়ি কর নামাশ্রয়॥

শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা পূর্বক কাকুতি করিয়া অবিশ্রান্ত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে দশবিধ নাম অপরাধ বিদূরিত হইয়া প্রেমানন্দ লাভের সৌভাগ্য হয়।

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।"

(ভাঃ ১২।১৩।২৩)

(ভক্তিপত্র ৭বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। ৮৪ পৃঃ)

প্রেমভক্তির ক্রমস্তর

শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের স্বরূপের ধর্ম। কিন্তু সে স্বরূপ বিভ্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্ত হয়ে মায়ার দাসত্ব করছে অন্যান্য যোনি অপেক্ষা মনুষ্যযোনি শ্রেষ্ঠ। কারণ, এই মনুষ্যদেহে সাধুসঙ্গ লাভ করে কৃষ্ণভজন করা সম্ভব। অন্যান্য জন্মেতে কৃষ্ণভজন করা যায় না "নরতনু ভজনের মূল"। তবে সকল মনুষ্য কৃষ্ণভজন করে না। অধিকাংশ মনুষ্যই মায়িক বস্তুতে আসক্ত হয়ে ভগবদ্‌ভজন করে না, ভগবদ্‌কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করে না খায়-দায় থাকে, এবং আমোদ প্রমোদ করে সময় কাটায়, ভাল মন্দের বিচার করে না, পাপ-পুণ্যের কথা চিন্তা করে না, নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ইহারা মনুষ্যদেহধারী হলেও অত্যন্ত হতভাগা।

এই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যাহাদের একটু কর্তব্য বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাহারা অনেক ভাল, যিনি আমার অসহায় অবস্থায় পালন-পোষণের জন্য পিতা মাতার আশ্রয় দিয়েছিলেন, জীবনধারণের জন্য আলোক-বাতাস-খাদ্য-বিষয়-ঐশ্বর্য্য আদি প্রদান করেছেন, সেই পরম করুণাময় ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁহার সন্তোষমূলক সেবা করা নিতান্ত কর্তব্য। এইরূপ কর্তব্য বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তাহারা কখন কখন ভক্তগণের নিকট গমন করে ভগবৎ কথা শ্রবণ করে কখন কখন নিজে নিজে রামায়ন-মহাভারতাদি পাঠ করে ভগবল্লীলাভূমি-তীর্থাদিতে গমন করে, শ্রীমন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণাম পরিক্রমাদি করে। যদিও তাহারা শুদ্ধভক্তিভাব নিয়ে করে না, তথাপি উহারা নাস্তিক ভগবদ্-বিদ্বেষিগণ অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে ইহা ভক্তিরাজ্যের অনেক নিম্নস্তরের কথা।

যাহারা আদরের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, একটু প্রাণের টানে শ্রীবিগ্রহের দর্শন করে, হরিকথা শ্রবণ করে, তাহাদের অধিকার আরও উন্নত; ইহারা ভাগ্যবান্,

ভগবন্নাম, ধাম ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই "প্রকৃত ভাগ্যবান্" বলে। ভগবদ্ রাজ্যে ইহাদের একটা স্থান আছে, তাহাদের এই শ্রদ্ধা যদিও কোমল তথাপি ইহাদের ভক্ত, ভগবান ও ভক্তিতে একটু আদর ভাবের উদয় হওয়ায় ইহারা নাস্তিক ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। প্রাক্তন সুকৃতির ফলে বা কোন মহতের বিশেষ অনুগ্রহের ফলে অহৈতুকী, কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে ঐ প্রকার শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। যাহারা ভাল ভাল খাওয়া-দাওয়া করে, দালান -কোঠায় বাস করে, ভাল-ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেই প্রকৃত ভাগ্যবান্ বলা যায় না। ভগবানের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে, তাহাদিগকেই প্রকৃত ভাগ্যবান্ বলা যায়।

"কৃষ্ণভক্তি আছে যার সেই ভাগ্যবান্"

ঐ শ্রদ্ধার ফলেই তাহারা পরমার্থ পথে অগ্রসরের সৌভাগ্যলাভ করতে পারে। যাহারা নানাবিধ বাধা বিপত্তিকেও ভগবৎ সেবা হতে চ্যুত হয় না, তাহারা অধিকতর ভাগ্যবান্। তাহাদের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে।

ঐরূপ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ যখন নিষ্ঠার সহিত বা নিয়মের সহিত ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করতে থাকেন, তখন তাহারা আরও উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাদের Position অনেক উন্নত, তাঁহারা কোমল শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হতে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন, ইহা হতে আরও উন্নতস্তরের কথা আছে। ইহারা শুধু কর্তব্য-বুদ্ধিতে ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্তন বা সেবা করেন না, রুচির সহিত ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তন করেন, অর্থাৎ ভগবৎ সেবা না করে থাকতে পারেন না। এমনকি ভগবৎ তোষণের জন্য নিজেদের দেহ-মনের সুখকর সঙ্গত্যাগ করেও অত্যন্ত রুচির সহিত ভগবৎ সেবা করেন। যখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্তির উদয় হয়, তখন কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। —ইহা আরও উন্নতস্তরের কথা। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও উন্নতস্তর আছে। ঐ অবস্থার নাম 'ভাব' বা 'রতি'। ভগবানে রতির উদয় হলে তাঁহার সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন ইঁহারা আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে এক মুহুর্ত্তের জন্যও ছাড়তে পারেন না। ভক্তবৎসল প্রভুও স্বীয় প্রেমাস্পদ

ভক্তগণকেও ছাড়তে পারেন না, এইরূপ প্রিয়তা ভাবকেই রতি বলে। ঐ রতি যখন শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে, তখন ইহাকে "প্রেম" বলে। স্বামী স্ত্রী প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়, উহা মায়িক প্রীতি; উহাতে আপাততঃ সুখ হলেও পরিণামে শোক ভয় মৃত্যুরূপ দুঃখলাভ হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্ত ভগবানে যে প্রীতি, উহাতে "অশোক অভয় অমৃত" লাভ হয়। সুতরাং 'মায়িক প্রীতি' ও 'ভগবৎ প্রীতি' এক নহে। মায়িক প্রীতিতে এক তরফা সুখ হয়। পুত্র মাতার দ্বারা নিজের সুখ আদায় করে নেয়। মা মায়ার আকর্ষণে অবশেই পুত্রের সুখবিধান করে যায়। কিন্তু ভক্ত ভগবানের সেবা সে প্রকার নহে। ঐ সেবায় উভয়েরই বিমল আনন্দের উদয় হয়ে থাকে। ভক্ত ও ভগবান উভয়েই সুখী হন, ভগবানের সেবায় কিছু ব্যবহারিক দুঃখ হলেও ভক্ত উহাকে দুঃখ বলে অনুভব করেন না।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ) (শরণাগতি)

প্রেমলাভের প্রধান উপায় হচ্ছে—সাধু-সঙ্গ, এই সাধুসঙ্গ সকলে লাভ করতে পারে না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভক্ত ভগবানের সুখকর অনুষ্ঠান করলে সুকৃতির উদয় হয়। তখন ওই সুকৃতিমান ব্যক্তি মহতের নিকট হতে ভক্তি লতার বীজ লাভ করে থাকেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

প্রাক্তন সুকৃতিলব্ধ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণান্তে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে অনর্থ সকল নিবৃত্তি হইতে থাকে। অতঃপর তাঁহার ভজনে নিষ্ঠা রুচি ও আসক্তির উদয় হইয়া ক্রমশঃ ভাব বা রতি অবশেষে "প্রেম ভক্তি" উদয় হইয়া থাকে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ
সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ,
ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬)

(শ্রী ভক্তিপত্র ৮ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবিধ চিন্ময় লীলা

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তিনি সর্বশক্তিমান, অখিলরসামৃতমূর্তি, চিন্ময় গোলোকধামে তিনি নিত্য নবকিশোর নটবর স্বরূপে অবস্থিত। তিনি চেতনাচেতন-স্থাবর-জঙ্গম-স্থূল-সূক্ষ্ম সকলেরই আদি মূল বা অংশী। তিনি নির্ম্মল জীবসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যতত্ত্ব। সেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলার মধ্যে প্রধান পাঁচটি চিন্ময় লীলা আছে (১) নিত্যলীলা, (২) সৃষ্টিলীলা (৩) অবতার লীলা, (৪) শ্রীকৃষ্ণের বাচ্যাবতার শ্রীবিগ্রহ বা চিন্ময় অর্চ্চালীলা, (৫) বাচক-অবতার শ্রীনাম ও তল্লীলাকথারূপ ভাগবতলীলা।

চিন্ময় 'নিত্যলীলা':—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব-আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর॥

*　　*　　*　　*

"চিদানন্দদেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর"।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
"অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্॥

সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণই—"ব্রহ্ম"-পরমাত্মা"-"ভগবান" এই ত্রিবিধ প্রতীতিরূপে নিত্য প্রকাশিত, "ব্রহ্ম"-তাহার অঙ্গকান্তি-নির্বিশেষ প্রকাশ, বিশেষ জ্ঞানীগণ জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে অনুভব করিতে থাকেন; "পরমাত্মা" তাঁহার আংশিক প্রকাশ; যোগীগণ যোগমার্গে পরমাত্মাকে হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে দর্শন করিতে পারেন। "স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই" পরিপূর্ণ সবিশেষ-প্রকাশতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিমার্গে অসমোর্দ্ধ ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবালাভ করে তাহাকে প্রেমে বশীভূত করিতে পারেন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাতে বড় তাঁর সম, কেহ নহে আন॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ-গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বসতিস্থল শ্রীগোলোকধাম, তথায় তিনি সচ্চিদানন্দময়-গোপমূর্তিতে যোগমায়া-স্বরূপশক্তিদ্বারে সর্বরসের নিত্য পরিকরগণের সেবা গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন আছেন। তিনি নিজে

অচিন্ত্য স্বরূপশক্তি-প্রভাবে প্রেমের বিষয়বিগ্রহ হইয়াও অনন্ত আশ্রয়বিগ্রহ বা পরিকর প্রকট করিয়া নিত্য নবনবায়মান প্রেমাস্বাদন করিতেছেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি।"

* * * *

শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
"অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার।"
বয়সো বিবিধত্বেহপি সর্বভক্তি-রসাশ্রয়ঃ।
ধর্মী-কিশোর এবাত্র "নিত্যলীলা" বিলাসমান্॥

* * * *

স্বয়ংরূপের গোপবেশ গোপ-অভিমান।

শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে স্বরূপশক্তির সন্ধিনীবৃত্তির দ্বারা নিত্য নবনবায়মান সেবোপকরণাদি প্রকট করান,—সম্বিৎবৃত্তির দ্বারা আশ্রিতজনগণকে নিত্য-সেবকজ্ঞান প্রদানপূর্বক সেবায় নিযুক্ত রাখেন এবং হ্লাদিনী বৃত্তির দ্বারা ভক্তগণসহ নিজে প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। ইহাই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা। মথুরা ও দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণ আদি চতুর্ব্যূহ-শ্রীবাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশিত থাকিয়া এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীবৈকুণ্ঠধামে স্বীয় বিলাসবিগ্রহ শ্রীনারায়ণের চারিপাশে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ-আবরণরূপে অবস্থানপূর্বক চিন্ময় "নিত্যলীলা" প্রকট করিতেছেন।

"আদিচতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্যকারণ॥
শ্রীকৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইহার বাস॥

এই চারি হৈতে চব্বিশমূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ, নামভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণচতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পরিচ্ছেদ)

এই প্রকারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৈকুণ্ঠে "নিত্যলীলা" রস উপভোগ করিতেছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের "চিন্ময় নিত্যলীলা।"

সৃষ্টিলীলাঃ—

শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ মূল সংকর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই আদি পুরুষাবতার। তিনি বহিরঙ্গা মায়ার প্রতি ঈক্ষণ প্রদানপূর্বক স্পর্শাভাসে উহাকে ক্ষোভিত করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে সৃষ্টি করেন। জড়মায়ার সৃষ্টি করার সামর্থ্য থাকে না। লৌহের যেরূপ দাহিকাশক্তি থাকে না। কিন্তু ঐ লৌহকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সংস্পর্শে রাখিলে উহারও দহনশক্তি লাভ হয়। সেইপ্রকার মায়া জড় হইলেও ঈশ্বরের চিৎ ঈক্ষণ প্রভাবে ঐ মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণকে প্রসব করিতে সমর্থ হন।

কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎকারণ।
সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন॥
কারণাব্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥
সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি বীর্য্যের আধান॥

সাঙ্গ বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পরিচ্ছেদ)

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁই ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে।
তাহাতে সংকর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্তে পায় দাহশক্তি॥

দ্বিতীয় পুরুষাবতার শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে স্বীয় পৃথক-পৃথক মূর্তি প্রকট করিয়া সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী পালকরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার নাভিপদ্ম হৈতে ব্রহ্মাকে প্রকট করাইয়া (সৃষ্টিকর্তা) ব্রহ্মার দ্বারা অনন্তজীব সমূহকে সৃষ্টি করান এবং পদ্মনালস্থ চৌদ্দভুবনে উহাদের বাসস্থান প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব।

* * * *

সেই পুরুষ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্তে প্রবেশিলেন বহুমূর্তি হইয়া॥
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ শয্যায় শয়ন করিল॥
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহ ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন॥

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্র শীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই ॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পরিচ্ছেদ)

তৃতীয় পুরুষাবতার শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া সকলকে পালন পোষণ করিতেছেন। তিনিই যুগে যুগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন, ভক্তগণকে রক্ষা ও অধর্মের বিনাশ করিয়া থাকেন।—

সকল জীবের তেঁহো হ'য়ে অন্তর্যামী।
জগৎ পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥
যুগমন্বন্তর করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম সংহার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ-২০)

এই প্রকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাবতারগণের দ্বারা অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডগণকে সৃষ্টি করিয়া ভগবৎভোলা জীবসমূহকে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা ত্রিতাপে জর্জ্জরিত করাইয়া থাকেন এবং পুনরায় তাহাদিগকে অহৈতুকী কৃপা করিয়া সাধুশাস্ত্র আত্মরূপে সঙ্গদানপূর্বক বিষয় হইতে মুক্ত করাইয়া শ্রীচরণে আকর্ষণ করেন। ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের "সৃষ্টিলীলা" বলে।

অবতারলীলা :—

তটস্থাখ্য জীব স্বসুখকামী হওয়ায় অনিত্য মনমুগ্ধকর মায়িক বস্তুতে আসক্ত হইয়া দুর্জ্জয়কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব করিতে করিতে চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমন করিতে থাকে এবং দুরত্যয়া মায়া কর্ত্তৃক ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক,

আধিদৈবিক) তাপে ক্লিষ্ট হইয়া রোগ-শোক জরা-ব্যাধি আদি বিবিধ দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। তাহার পরমাত্মীয় নিত্যবান্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিস্মৃত হওয়ার জন্যই যে তাহার এই দুর্ভোগ তাহা সে বুঝিতে পারে না। তাই পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিয়া তদভিন্নবিগ্রহ মহান্তগুরু, বেদশাস্ত্র ও পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মঃ-২০)

যখন কৃষ্ণবিস্মৃত ভোগপরায়ণ নরগণ বেদ-বিরুদ্ধ পাপ ও অধার্মিক কর্মসমূহ উচ্ছৃঙ্খলভাবে করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রগত জীবন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তখন পরম করুণাময় ভগবান দুষ্টগণকে বিনাশ করার জন্য, শিষ্ট ভক্তগণকে পালন করার জন্য এবং শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম সম্যকভাবে স্থাপন করার জন্য কখন তিনি নিজে, কখন বা তাহার অংশ যুগাবতার-লীলাবতারাদিরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হন। ইহাই জীবগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম করুণার নিদর্শন এবং ইহাই তাহার "চিন্ময় অবতার-লীলা।"

সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি "অবতার" নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতার ধরে "অবতার নাম"॥

(চৈঃ চঃ মঃ-২০)

শ্রীকৃষ্ণ মায়াবদ্ধ পতিত দুর্গত জীবগণের পরিত্রাণের জন্য স্বীয় চিন্ময় অপ্রাকৃত ধাম হইতে নিজ দিব্যমূর্ত্তি পার্ষদবর্গ ও ধামসহ এই মর্ত্ত জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি যদি নিজ শ্রীবিগ্রহকে এ জগতে অবতরণ বা প্রকট না করাইতেন তবে কেহ তাহাকে দর্শন করিতে বা জানিতে পারিত না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ বা অনুভব করিতে পারিত না—শুধু তাহার বিষয় একটা কল্পনাই করিয়া রাখিত। তিনি কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিয়াই জীবগণের সংসার দুঃখের অবসান হয়,—তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত শ্রবণে বহুজন্মের সঞ্চিত অজ্ঞানতার বিনাশ হয়। তাঁহার "গোপালগোবিন্দ," "শ্যামসুন্দর", "যশোদানন্দন" "ভক্তবৎসল", "দীনবন্ধু", "দামোদর", "পুতনাঘাতন", "রাসরসিক", "রাধারমণ" প্রভৃতি নাম, রূপ-গুণ-লীলা সূচক অবতারাবলীর কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ এই জড় জগৎ হইতে চিন্ময় ভগবৎ ধামে গমন করিতে সমর্থ হন। পরম-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই প্রকারে "অবতারলীলা" গ্রহণ করিয়া সর্বজীবের পরম মঙ্গলবিধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাচ্যাবতার শ্রীবিগ্রহ বা চিন্ময় অর্চ্চালীলা

ভগবান যখন ভৌমলীলা সম্বরণ করিয়া চিন্ময় ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখনও প্রিয় ভক্তগণকে সেবানন্দে নিমগ্ন রাখার জন্য "শ্রীবিগ্রহরূপে" জগতে প্রকট থাকেন।

মথুরাতে "কেশবের" নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম "জগন্নাথ নাম।"
প্রয়াগে "মাধব", মন্দারে "শ্রীমধুসূদন।"
আনন্দারণ্যে "বাসুদেব"-"পদ্মনাভ"-জনার্দ্দন।
বিষ্ণুকাঞ্চীতে "বিষ্ণু", "হরি" রহে মায়াপুরে।
ঐছে আর নানামূর্ত্তি-ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥

এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস॥
সর্বত্র প্রকাশ তার ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপিতে॥

(চৈঃ চঃ মঃ-২০)

স্বয়ম্ভু বিগ্রহ ছাড়া মহাজন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণও সাধারণ জনগণের সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান জগতে প্রকটিত হইয়া যেরূপ দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন আদি লীলা করেন, সেইরূপ তিনি "বিগ্রহরূপেও" প্রকটিত থাকিয়া অনেক অলৌকিক লীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন। ভক্তের প্রার্থনায় "শ্রীগোপালদেব" বিগ্রহরূপে সুদূর বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে দক্ষিণ-ভারতের বিদ্যানগরে গমনপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিয়া "সাক্ষীগোপাল" নাম ধারণ করিয়াছেন। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ প্রিয়ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে ক্ষীর প্রসাদ সেবন করাইবার জন্য নিজে ক্ষীর চুরী করিয়া তাহাকে (শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে) ক্ষীরপ্রসাদ সেবন করাইয়া "ক্ষীরচোরা" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ভক্ত লাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন॥

* * * *

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে যবন সম।
সেই সে পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥

শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীজন্মযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, শ্রীরথযাত্রা, শ্রীরাসযাত্রা, শ্রীদোলযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বে পর্বে নানাপ্রকার লীলা করিয়া ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ প্রদান এবং সেবা সৌভাগ্য প্রদান করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবিত-"শ্রীগোবিন্দদেব" শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত "শ্রীমদনমোহনদেব" শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর সেবিত-"শ্রীরাধাদামোদরদেব", শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সেবিত-"রাধারমনজীউ", শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর সেবিত -"শ্রীগিরিধারী", শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবিত-"শ্রীগোকুলানন্দজী", শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরানীর সেবিত "মহাপ্রভুবিগ্রহ", শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সেবিত "শ্রীগৌরনিত্যানন্দজীউ", দ্বিজবাণীনাথ সেবিত-"শ্রীশ্রীগৌরগদাধর", মীরাবাঈ সেবিত-"গিরিধারী লালাজী" প্রভৃতি বিগ্রহগণ অদ্যাবধি সেবিত হইয়া ভক্তগণকে অশেষ আনন্দ প্রদান করিতেছেন। অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগতের বিভিন্ন স্থানে অনেক মঠ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া আপামর সর্বসাধারণকে শ্রীবিগ্রহের সেবা সুযোগ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহসেবা এক অপূর্ব সম্পদ। শ্রীবিগ্রহগণ জগতে প্রকট আছেন বলিয়া ভক্তগণ অবাংমানসগোচর ভগবানের সহিত প্রীতির আদান প্রদান করিতে পারেন। ভক্তগণের সেবা বিশেষরূপে গ্রহণ করেন বলিয়াই তিনিই "বিগ্রহ।" সুতরাং স্বয়ং ভগবানে আর তাঁহার শ্রীবিগ্রহে কোন ভেদ নাই।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।

তাই এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে,-"শ্রীকৃষ্ণ" তাহার "শ্রীবিগ্রহ এবং তাহার "নাম"—এই তিনে কোনই ভেদ নাই, তিনিই একরূপ।

চৌষট্টি প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহসেবন—এই পাঁচ অঙ্গ শ্রেষ্ঠ। "কৃষ্ণ প্রেম জন্মে, এই পাচের অল্প সঙ্গ"। সুতরাং যিনি প্রীতি পূর্বক এই শ্রীবিগ্রহসেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমলাভ করিতে পারেন।

বাচক অবতার শ্রীনাম ও তল্লীলা-কথারূপ শ্রীমদ্ভাগবত—লীলারূপ

শ্রীনামরূপ ও কথারূপ শ্রীভাগবত-শ্রীকৃষ্ণের আর একটি বাচক-অবতার লীলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নামে কোন ভেদ নাই, উভয়েই অভিন্ন। বরং শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার নামের অধিক মহিমার কথা শাস্ত্রে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নাম-নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হতে অধিক করুণ ॥
কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি।
প্রাণ ভরি ডাকে নাম "রাম",-"কৃষ্ণ"-হরি ॥
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥

শ্রীবিগ্রহ সেবায় দেশ-কাল-পাত্রের বিচার আছে। বেদমন্ত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া মন্দিরাদি পবিত্র স্থানে পূজার উপযুক্তকালে শ্রীবিগ্রহসেবা করিবেন। কিন্তু নাম সেবায় কোন দেশ-কালাদির বিচার নাই, শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিতে সর্বদেশ (সর্বস্থানে), সর্বকালে ও সর্বপাত্রে, (আচণ্ডালে ব্রাহ্মণের) অধিকার আছে।

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥

* * * *

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥

এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যাহারা কর্ম-জ্ঞান যোগ-তপস্যা প্রভৃতির নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সেইসব ভাগ্যবান জনগণ নিরন্তর নামামৃত পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব যদি শ্রীনাম প্রভুর অনন্য শরণ গ্রহণ করিয়া আকুল প্রাণে শ্রীনামের কৃপা প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহার যাবতীয় তাপরাশি বিদূরিত হয় এবং মন-বুদ্ধি-অহংকারাত্মক লিঙ্গ শরীর নাশান্তে চিন্ময় ধামে দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

মায়াবদ্ধ জীব হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত সকলকেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" জ্ঞানীগণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলে তাহাদের অপ্রারব্ধ কর্মের নাশ হইতে পারে, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ পূর্বকৃত কর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নামাশ্রয়ী শুদ্ধভক্তের যাবতীয় প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ নাশ হইয়া যায়। তাঁহার বিশুদ্ধ হৃদয়ে আর কখনও কর্মজ্ঞান যোগাদির কোন বাসনার উদয় হইতে পারে না।

ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর তুমি সর্বশক্তিধর
জীবের কল্যাণ বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু'
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত তুমি সব কর হত
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হয়ে দীন অকিঞ্চন
নাহি দেখি অন্য প্রতিকার"
তব স্বল্প স্ফূর্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে॥

শ্রীকৃষ্ণ নামে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান আছে। নামের ঐকান্তিক আশ্রিত জনের সমস্ত পাপ-তাপ-আর্ত্তি-অনর্থ অপরাধ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার হৃদয় সিংহাসনে স্বয়ং ভগবান নিরন্তর বিরাজিত থাকেন। শ্রীনামের মহিমা বিশ্বে বিপুলভাবে প্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামের মহিমা অতি সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করেছেন॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনং
শ্রেয়কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীনাম সংকীর্ত্তনপ্রভাবে জীবের চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জ্জন হয়; সংসার দাবানলের নির্বাপন হয়, পরম মঙ্গলোদয় হয়, পরবিদ্যার জীবন স্বরূপ হয়। আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধন হয়। প্রতি পদে পদে নামামৃতের আস্বাদন হয়। আত্মার পরিপূর্ণ নির্মলতা ও স্নিগ্ধতা লাভ হয়। শ্রীভগবানের লীলা কথারূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের আর একটি বাচক-অবতার। এই বাচক-অবতার-শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়ে জীব অতি সহজে অল্পকালে সর্ব্ব অনর্থ মুক্ত হইয়া ভগবদ্ অনুভব লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে এবং ভগবানে প্রেমলাভ করিয়া ভগবানকে বশ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধভক্তির সাধনে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বাচক অবতার শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগতের প্রভাব বর্ণন করিয়া শ্রীবেদব্যাসজী বলিতেছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং
সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো
হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্তবে ভগবানের সমস্ত অবতারের নামকীর্ত্তনান্তর প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বিশেষরূপে বন্দনা করিয়া পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের বাচক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের গুণ মহিমা বর্ণন করিয়াছেন :—

সর্বশাস্ত্রাব্ধি পীযূষ সর্ববেদৈক সৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্ব্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ ॥
সর্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্ত্তিত ॥
পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায়তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্‌ মদ্‌গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্‌ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তুতে ॥
অসাধুসাধুতাদায়িন্নতি নীচোচ্চতাকরঃ।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্নাহৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুরঃ ॥

পরম করুণাময় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই চিন্ময় "নিত্যলীলা", "সৃষ্টিলীলা," "অবতারলীলা", "শ্রীবিগ্রহলীলা" নিত্যকাল প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ বিধান করিতেছেন এবং নিজেও পরমানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত আছেন।

———

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু

মহাভাগবত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বাংলার প্রধান মন্ত্রীত্ব পদ মলবৎ পরিত্যাগে ইচ্ছুক হওয়ায় নবাব হুসেন সাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক কৌশলপূর্বক তিনি কারামুক্ত হইয়া দুর্গম পথ পর্ব্বত, নদী অতিক্রম করিয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন। সেখানে লোক মুখে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে তথায় শুভাগমন সংবাদ অবগত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেছিলেন সেই চন্দ্রশেখর বৈদ্য মহাশয়ের গৃহের বহির্দ্বারে উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুর দর্শন আকাঙ্খায় অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয়ের উৎকণ্ঠা জানিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরজীকে বলিলেন তোমার দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস। শ্রীচন্দ্রশেখর দ্বারদেশে কোন বৈষ্ণব না দেখিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন যে সেখানে কোন বৈষ্ণব নাই। একজন দরবেশ মাত্র বসিয়া আছেন। তখন মহাপ্রভু ঐ দরবেশকেই সত্বর আনয়ন করিতে বলিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে উহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। শ্রীসনাতন অতি দৈন্যের সহিত নিষেধ পূর্বক বলিতে লাগিলেন,—"আমি অতি অস্পৃশ্য, পতিত, কৃপা পূর্বক আমাকে স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমানন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে তিনি শ্রীসনাতন প্রভুকে স্নেহপূর্বক তাঁহার মলিন অঙ্গ হস্ত দ্বারা মার্জন করিতে করিতে বলিলেন "তোমার ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণবের দর্শন ও স্পর্শনে ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ পবিত্র হইতে সমর্থ।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ (ভাঃ ১।১৩।১০)
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।

* * *

দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥

অনন্তর মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীসনাতন প্রভু স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করাইয়া গঙ্গাস্নান পূর্বক বৈষ্ণববেশ ধারণ করিলেন। শ্রীতপন মিশ্র তাঁহাকে একখানি নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না, দৈন্যপূর্বক নিকট হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। তিনি ঐ বস্ত্রখানি চিরিয়া দুইখানা বহির্বাস ও ডোর কৌপীন প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিলেন। শ্রীতপনমিশ্র মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তাঁহাকে প্রদান করিলে তিনি উহা পরমানন্দে সেবা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার অঙ্গের ভোট কম্বলটির দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা শ্রীসনাতন বুঝিতে পারিলেন যে বৈরাগ্য বেশধারীর এত মূল্যবান্ পোষাক পরিধানে মহাপ্রভু সন্তোষ হইতেছে না। তিনি তখন গঙ্গার তীরে গিয়া দেখিলেন একজন বৈরাগী সাধু স্বীয় কান্থাখানি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতেছেন, শ্রীসনাতনপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া ঐ কান্থাখানি চাহিয়া লইলেন এবং স্বীয় ভোট কম্বলটি উহাকে প্রদান করিলেন। শ্রীসনাতনের ঐ বৈরাগ্যবেশ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অন্তরে খুশী হইয়া বলিতে লাগিলেন, পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ তোমার শেষ বিষয় ভোগরূপ রোগটি খণ্ডন করিয়া দিলেন। সৎবৈদ্য চিকিৎসার দ্বারা সমূলে রোগীর রোগ বিনাশ করিয়া থাকেন। বৈরাগী হইয়া যদি ভোগ বিলাসময় জীবন যাপন করে তবে তাহার বৈরাগ্য ধর্মের হানি হয় এবং লোকেও তাহাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন প্রভু দৈন্যের সহিত বলিলেন আপনার কৃপাতেই আমার কুবিষয় ভোগ স্পৃহা সমূলে দূর

হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন শ্রীসনাতন প্রভু মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ পূর্বক বিনীতভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকে জানিতে চাহিলেন এবং চারটি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন তাহার চরণে নিবেদন করিলেন।

১। কে আমি ২। কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
৩। ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥
৪। সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥

(চৈ চঃ মঃ ২০। ১০২।১০৩)

বিজ্ঞ শিরোমণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী সর্বজীবের পরম মঙ্গল উদয়ের জন্য এই প্রশ্ন চতুষ্টয় মহাপ্রভুর নিকট আবেদন করিলেন। তখন মহাপ্রভু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জীব মঙ্গলার্থে বলিতে লাগিলেন। তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, তোমাতে তাহার কৃপা পূর্ণরূপে বিরাজিত তোমাকে ত্রিতাপ ক্লেশ দিতে পারে না তুমি সব তত্ত্ব জানিয়াও অজ্ঞ লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন চতুষ্টয় করিয়াছ। বিজ্ঞ ব্যক্তিও তত্ত্ব জানিয়া ঐ বিষয়ে আরো দৃঢ়তার জন্য শ্রেষ্ঠ জনের নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া থাকেন তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আচারবান্ প্রচারক, শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রচারে তুমি সত্য সত্যই সুদক্ষ, ক্রমে ক্রমে তোমার প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর দিতেছি স্থির চিত্তে শ্রবণ কর।

১। "কে আমি"—এই প্রশ্নের উত্তর অতি গম্ভীর। "আমি" বলিতে দেহ মন, ইন্দ্রিয় আদি বুঝিতে হইবে না। দেহ, মন, আদি জড়বস্তু, উহাদের স্বরূপে ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি নাই, দেহ মনের মধ্যে এমন একটা বস্তু আছে, যে বস্তু দেহ হইতে চলিয়া গেলে উহারা কিছুই করিতে পারে না, জড়বৎ পড়িয়া থাকে, সেইবস্তুকেই "জীবাত্মা" বলিয়া জানিবে। এই অণুচৈতন্য জীবাত্মা বৃহচ্চৈতন্য

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস, কৃষ্ণ সেবাই তাহার নিত্য ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তি (চিৎশক্তি), বহিরঙ্গা মায়াশক্তি (অচিৎ শক্তি), তটস্থা শক্তি (জীবশক্তি) এই তিন শক্তি প্রধান। জীবশক্তি, চিৎশক্তি ও অচিৎশক্তির মধ্যদেশে তটস্থভূমিতে অবস্থিত থাকায় উভয় দিকে তাহার আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা থাকে। যদি সে মায়ার আপাত চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া উহা ভোগ করিতে ধাবিত হয়, তবে সে মায়ার কবলিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। আর যদি সে চিৎশক্তির আকর্ষণে পড়িতে পারে তবে সে ভগবৎ রাজ্যে গমন পূর্ব্বক ভগবৎ পার্ষদত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য জীবশক্তিকে "তটস্থাশক্তি" বলা হয়।

জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ অনুচৈতন্য বস্তু। আর শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ বিভু-চৈতন্য বস্তু, উভয়েই চেতন ধর্মে অবস্থিত বলিয়া উহারা তত্ত্বতঃ অভেদ আর জীব অনু-চৈতন্য বলিয়া মায়াশক্তির বশ যোগ্যতা আছে। কিন্তু কৃষ্ণ বৃহৎ চৈতন্য এবং মায়াধীশ, তাই জীব ও কৃষ্ণে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান।

"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ"
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীবে ভেদ ॥

যেমন সূর্য্য পূর্ণ বস্তু, কিরণ তার অণু অংশ এবং তার বর্হিদেশে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশেষ ভিন্ন অংশই। অনুচৈতন্য জীব-শক্তি সেইজন্য উহা মায়ায় বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপ অসংখ্য স্ফুলিংগ কণা বহির্গত হয় এবং আধার অভাবে উহাদের নির্ব্বাপিত হইবার যোগ্যতা থাকে, সেইরূপ বিভিন্নাংশ জীব অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার মায়া কবলিত হইবার যোগ্যতা আছে।

"সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন তটস্থাখ্য জীব পরতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায় অর্থাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, যখন সে মায়িক জগতের জড়ীয় সুখ ভোগের অভিলাষ করিতে যায়, তখনই সে অঘটন ঘটন পটীয়সী দৈবী মায়ার কবলে কবলিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। কিন্তু সে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধির নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিলেও মায়ার আপাত সুখে মুগ্ধ হইয়া যে কর্ম্মের দ্বারা দুঃখ হয়. সেই কর্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

"অতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দি হয়ে মায়াপাশে
রহিলে বিকৃত ভাবে,
দণ্ডযথা পরাধীন।"

* * *

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।

৩। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—

মায়ামুগ্ধ কৃষ্ণভোলা জীবগণ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে দেখিয়া পরম দয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাদের জন্য বেদ পুরাণ শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন ; ইহা জীবের প্রতি ভগবানের করুণার নিদর্শন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)
সাধুশাস্ত্র আত্মরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৩)

শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য, ও বিমুখ জীবগণকে উন্মুখ করাইয়া স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণের জন্য বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় বিগ্রহ সদ্গুরু রূপে এই ভূলোকে আবির্ভূত হন এবং তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালনের জন্য চৈত্ত্য গুরুরূপে উহাদের চিত্তে প্রকটিত থাকেন।

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

জীব যদি সেই মহান্তগুরুর নিয়ামকত্বে অবস্থিত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীতা ৭।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—যে ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাতঃ সংযত ইন্দ্রিয় গুরুর চরণ আশ্রয় পূর্বক সম্ভ্রম বুদ্ধিতে ও প্রিয় জ্ঞানে তাঁহার উপদেশে ঐকান্তিক ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন তিনি দৈবী মায়ার হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

জীবের বাস্তবহিত বা পরম মঙ্গল লাভের ইহাই একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায়ে দুস্তরা মায়াকে জয় করা যায় না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥

৪। "সাধ্য-সাধন"তত্ত্ব নিরূপণে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন—পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধী তত্ত্ব জীবের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ আছে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতির কথা কীর্তন করিয়াছেন। উঁহাদের নাম "ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্।"

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১

মুক্তি কামীগণ জ্ঞানমার্গে "ব্রহ্মের" আরাধনা করেন। সিদ্ধি কামীগণ যোগমার্গে "পরমাত্মার" উপাসনা করেন এবং প্রেমাকাঙ্খীগণ ভক্তিমার্গে "ভগবানের" ভজন করেন।

ভক্তিযোগে ভক্তপায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে সেই সব।
"ব্রহ্ম"—"আত্ম"রূপে-তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৭)

* * *

শাস্ত্র কহে—কর্ম, জ্ঞান, যোগ-ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

(চৈ চঃ মঃ ২০।১৩৬)

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে "সম্বন্ধ তত্ত্ব" শ্রীকৃষ্ণভক্তি—"অভিধেয়" বা "সাধন', এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই "প্রয়োজন" বলেছেন।

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বলেছেন—ভক্তির দ্বারা আমি যেরূপ বশীভুত হই, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ব্রতাদি অন্য সাধনের দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভাঃ ১১।১৪।২১)

যে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করা যায়, সেই ভক্তিকে "শুদ্ধভক্তি" বলে। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাহার সহিত প্রীতির আদান-প্রদান করাই ভক্তগণের একমাত্র কাম্য বা প্রয়োজন। ধর্ম-অর্থ-কাম লাভ করা বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করা সাধনের প্রকৃষ্ট ফল নহে। ভক্তগণ ভগবানের কৃপায় এই সব তুচ্ছ ফল না চাইলেও পাইয়া থাকেন।

না চাইতেও নামের গুণে ও সব ফল পাইরে।

দরিদ্র ব্যক্তি যদি প্রচুর ধন পায়, তবে অনতিকাল মধ্যেই তাহার দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরিত হয়। সেইরূপ ভক্তগণ যখন প্রেমানন্দ-লাভ করেন তখন তাহাদের ত্রিতাপের জ্বালা বা দুঃখ আনুসঙ্গিকভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়।
সুখ ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪০-১৪১

অনেকে মনে করেন ভগবদ্ দর্শন লাভ করাই সাধনের ফল বা প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রেমকেই সাধনের প্রকৃষ্ট ফল বা প্রয়োজন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্রে আরও দেখা যায় অনেক অনেক জ্ঞানী-যোগী-ঋষি এমন কি ভগবৎ বিদ্বেষী অসুরগণও ভগবানকে দর্শনলাভ করিয়াও ভক্তিশূন্য হওয়ায় আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই, হিরণ্যকশিপু-রাবণ কংস-শিশুপাল-দন্তবক্র প্রভৃতি ভগবৎ বিদ্বেষীগণ ভগবানের দর্শন পাইয়াও ভক্তি শূন্য হওয়ায় আনন্দ লাভের পরিবর্ত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই, পরিশেষে ভগবৎ কর্ত্তৃক নিহতই হইয়াছে। সুতরাং ভক্তি রহিত ভগবৎ দর্শনকে সাধ্য বলা চলে না। এইজন্য ভগবানের প্রীতিময় সেবা বা প্রেমকেই

সাধ্য শিরোমণি, প্রয়োজন বলেছেন। আত্মসুখকর বৃত্তিকে কাম বলে আর কৃষ্ণসুখকর বাঞ্ছাকেই "প্রেম" বলে।

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'॥

এই প্রেমধন লাভ করার উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ মূলক "ভক্তি"। এই ভক্তির বিষয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১১)

অন্যাভিলাষিতাশূন্য-জ্ঞান-কর্মের-আবরণ রহিত এবং আনুকুল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন রূপ ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলে। মহাপ্রভুর অমৃতময় উপদেশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র সাধ্য সার এবং সেই সাধ্য বস্তু লাভ করিবার একমাত্র উপায় হচ্ছে "শুদ্ধভক্তি বা বা "উত্তমা ভক্তি"।

বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরে কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক যে অভূতপূর্ব শিক্ষামৃত জগতে সর্ব্বজীব মঙ্গলার্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত পান করিতে পারিলে ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবা দ্বারা প্রেমানন্দ সাগরে নিরন্তর নিমজ্জিত থাকিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নিগূঢ় সংবাদটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীসনাতন গীতা বলিয়া জানেন। কারণ জীবমঙ্গলার্থে স্বয়ং ভগবান যে অমৃত উপদেশ প্রদান করেন তাহাকেই "গীতা-শাস্ত্র" বলে। সর্ব বিশ্বে গীতা বলিতে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন সংবাদকেই জানিয়া থাকেন কিন্তু ঐ গীতা ছাড়া আরও অনেক প্রকার গীতা প্রচারিত আছেন। যেমন "শ্রীকপিল দেবহূতি গীতা"—"শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব গীতা"—ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য গীতা হইতে এই সনাতন গীতার

মাহাত্ম্য অধিক, কারণ এই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রীভক্তিতত্ত্ব সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি যেরূপ সুন্দরভাবে সুসিদ্ধান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোন গীতাতে সেরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিতহয় নাই।

জয় গৌরপার্ষদ প্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামী কী জয়, জয় কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কী জয়:—

জয় জয় প্রভু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন যাহা যশ গুণ গ্রাম॥

*　　*　　*

কবে সনাতন মোরে ছাড়াবে বিষয়।
নিত্যানন্দ সমর্পিবে হইয়া সদয়॥

*　　*　　*

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়াল জগত সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

জয়পুর করোলীতে শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহন দর্শন

২৬ শে অক্টোবর ১৯৬৪ সোমবার হইতে ২৫ নভেম্বর (১৯৬৪) ৩০ শে কার্তিক ১৩৭১ বঙ্গাব্দ রবিবার পর্য্যন্ত।

২৬ শে অক্টোবর সোমবার শিয়ালদা পাঠানকোট এক্সপ্রেসে গৌড়ীয় মিশনের তত্ত্বাবধানের এক রিজার্ভ বগীতে প্রায় ২০০ (দুই শত) তীর্থ যাত্রীগণকে লইয়া ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীজ্ঞানচন্দ্র নন্দী মহোদয় পরদিন ২৭ শে অক্টোবর প্রথমে গয়ায় শুভাগমন করেন। সেখানে এক ধর্মশালায় অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় মিশনের কীর্ত্তন মণ্ডলীর অনুগমনে তথাকার তীর্থ সমূহ দর্শনের জন্য যাত্রীগণ বহির্গত হইলেন।

গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীল গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ দর্শন বিপুল আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

তিনি কতিপয় সেবকসহ ২৭ শে অক্টোবর প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীভক্তিপত্রের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস এম, এ, (শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ) শ্রীকঞ্জাক্ষ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্যামল কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবক ছিলেন।

:—শ্রীগয়া কাশী ও প্রয়াগ দর্শন—:

(যাত্রিগণ) ফল্গুতীর্থে স্নান করি পাদতীর্থে গেল।

ভক্তসঙ্গে নৃত্যগীতে দর্শন করিল॥

তথা হৈতে গেল তাঁরা কাশী বিশ্বনাথ।
দর্শনান্তে স্নান কৈল উত্তর বাহিনীতে॥
প্রয়াগে যাইয়া অগ্রে দেখে গুরুদেবে।
যাত্রিগণে দেখি তাহা আনান্দনুভবে॥
রাত্রে গুরুদেব কৈল বরজে গমন।
ত্রিবেণী সঙ্গমে গেল প্রাতে যাত্রীগণ॥
স্নানান্তে বেণী মাধব করিল দর্শন।
নৃত্যগীত করি মঠে কৈল আগমন॥
প্রসাদ পাইয়া সবে করিল বিশ্রাম।
রাত্রিকালে সবে যাত্রা কৈল ব্রজধাম॥
উর্জ্জাব্রতে পূণ্যতিথি একাদশী দিনে।
যাত্রীগণ প্রবিষ্ট হইলা বৃন্দাবনে॥

—::—

দ্বাদশী-দিবসে গুরুদেবানুগমনে।
ধাম পরিক্রমা যাত্রা কৈল যাত্রিগণে॥
চারিখানা বাসে বসি চারি সম্প্রদায়।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন গায়।
আড়াই শতেক যাত্রি বসিল তাহাতে।
গুরুদেব বৈসে এক মোটর যানেতে॥
চলিয়া আইলা কৃষ্ণ জন্মভূমি স্থল॥
গুরুদেবে অগ্রে করি কীর্ত্তন মণ্ডল॥
মহাসংকীর্তন তথা হইতে লাগিল।
নৃত্যগীত কোলাহলে গগন ভেদিল॥

সেই কালে গুরুদেব প্রেমাবিষ্ট হইল।
যারা দেখিয়াছে তারা অনুভব কৈল॥
হাঁসে কান্দে নাচে গায় ভূমিতে লোটায়।
অশ্রু, কম্প, পুলক বিবর্ণ ভাব হয়॥
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে ধরণী উপরে।
মনে হয় ধামেশ্বরে কোলে লৈল তাঁরে॥
ক্ষণে উঠি নৃত্য করে, চারিদিকে চায়।
ক্ষণে বড় আঁখি করি উপরে তাকায়॥
না জানি কি ভাব তাঁর হইল তথায়।
দেখিয়া সে ভাব সবে বিমোহিত হয়॥

—::—

তবে শান্ত হয়ে চলে পরিক্রমা তরে॥
হর্ষে ভক্তগণ তাঁর অনুব্রজ্যা করে॥
যমুনার ঘাটে ঘাটে নাচিতে নাচিতে।
কীর্ত্তন করিয়া চলে বিশ্রাম ঘাটেতে॥
যমুনারে সবে তথা প্রণাম করিল।
কৃষ্ণ বলরাম অগ্রে নৃত্যগীত হৈল॥
প্রেমাবিষ্ট গুরুদেব পড়িল তথায়।
আকুল হৃদয়ে তেঁহো ভূমিতে লোটায়॥
নৃত্যগীত করি চলে যমুনা পুলিনে।
পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে ভক্তগণে॥
রঙ্গেশ্বর রঙ্গভূমি দর্শন করিল।
সংকীর্ত্তন করি সবে ভূতেশ্বরে গেল॥

তথা হৈতে পুনঃ গেল কৃষ্ণজন্মস্থলে।
কীর্ত্তন করিয়া বাসে বৃন্দাবনে চলে॥

১৭ই কার্ত্তিক ১৩৭১, ২রা নভেম্বর সোমবার

—ঃ শ্রীদাউজী মহাবন পরিক্রমা ঃ—

দ্বিতীয় দিবসে সবে শ্রীগুরু পশ্চাতে।
পূর্ববৎ চলে দাউজী দর্শন করিতে॥
প্রেমে নৃত্য করে তথা গুরু মহারাজ।
ভক্তগণ নাচে গায়—নাহি কোন লাজ॥
ব্রহ্মাণ্ড ঘাটেতে আসি বহু নৃত্য কৈল।
যমুনার স্নানে সবে শীতল হইল।
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিল দর্শন।
গোপালে দেখিল আসি শ্রীনন্দভবন॥
প্রেমানন্দে গুরুদেব নাচে বহুক্ষণ।
পুতনাদি বধ স্থান করিল দর্শন॥
সন্ধ্যাকালে বাসে বসি করিয়া কীর্তন।
গুরুদেব সঙ্গে সবে যায় বৃন্দাবন॥

১৮ই কার্তিক ১৩৭১, ৩রা নভেম্বর মঙ্গলবার

—ঃ শ্রীমধুবন ও শ্রীতালবন পরিক্রমা ঃ—

তৃতীয় দিবসে সবে বাসে করি চলে।
হরি সংকীর্ত্তন করি শ্রীব্রজমণ্ডলে॥
ক্রমে আসি উপজিল দিব্য মধুবনে।
মধুপানে রত রামে দেখে সর্বজনে॥
মধু দৈত্যে বধে এথা শ্রীমধুমহান।
তবে গেল ধ্রুব টিলা নির্জন কানন॥

সাধন করিয়া ধ্রুব এথা সিদ্ধ হৈল।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দানে তারে কৃপা কৈল॥
উচ্চ টিলা পরে "ধ্রুব-নারদ মূরতী।
বিরাজে" শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রম্য অতি॥
তাহা দেখি যাত্রিগণ চলে তালবনে।
ধেনুকারে বধ যথা কৈল সংকর্ষণে॥
শান্তনু কুণ্ডাদি দেখি শ্রীকুমুদবনে।
কীর্ত্তন করিয়া সবে গেল বৃন্দাবনে॥

—::—

১৯ শে কার্ত্তিক ১৩৭১ ৪ঠা নভেম্বর বুধবার

—: শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা :—

চতুর্থ দিবসে, মনের হরসে
গুরুমহারাজ সাথে।
বাসে বসি সবে, হরি হরি রবে
চলে গোবর্দ্ধন পথে।
বন উপবন, তরু লতাগণ
দিব্য শোভা প্রকাশিছে।
তাহা দেখি সবে, আনন্দানুভবে
গেল গিরিরাজ কাছে॥
প্রণমি তাঁহারে, চলে ধীরে ধীরে
মানসী গঙ্গার তীরে।
পবিত্র সলিল, পরশ করিল
আনন্দে প্রণাম করে॥

শ্যাম নটবর, গোবর্দ্ধনধর
হরিদেব শ্রীগোপালে।
দর্শন আশায় শ্রীমন্দিরে যায়
নতি করে ভূমিতলে॥
মোহন মূরতি, দেখি মুগ্ধ অতি
প্রেমাবিষ্ট গুরুদেব।
নাচে ভক্তসঙ্গে, করি নানা রঙ্গে
তুষ্ট হৈল—হরিদেব॥
ভকত সকলে, হইল বিহ্বলে
নৃত্যগীত কুতুহলে।
দণ্ডবৎ করি, সবে বলে হরি
গোবর্দ্ধন পথে চলে॥
আনোর-গোবিন্দকুণ্ড-পুছড়ী-হইয়া।
ধীরে চলে গিরিরাজ দর্শন করিয়া॥
ভক্তগণ নৃত্য করি কীর্ত্তন করয়।
কভু গুরুদেব পড়ি ধরণী লোটায়॥
গোবর্দ্ধন শোভা অতি অকথ্য অদ্ভুত।
কভু উচু কভু নীচু হয় অনুভূত॥
শ্যাম কলেবর তাঁর অতি সুচিক্কন।
দর্শনে পবিত্র হয় সর্বভক্তগণ॥
ক্রমে সবে শ্রীউদ্ধব কুণ্ড আদি করি।
রাধাকুণ্ডে উপজিল বলি হরি হরি॥
শ্যাম কুণ্ড রাধাকুণ্ড অতি মনোরম॥
প্রেমোদ্দীপ্ত গুরুদেব দেখে অবিরাম॥
কি আনন্দ হৈল তাঁর বর্ণন না যায়।

বহুকাল অন্তে যেন লুপ্তধন পায়।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ধুলিতে লোটায়।
কভু ভাবাবেশে রয় কভু মূর্চ্ছা পায়।
উঠিয়া পরশ করে কুণ্ডদ্বয়নীর।
স্তব স্তুতি পাঠ করে প্রেমেতে অধীর।
দণ্ডবৎ ভক্তগণ করিয়া বসিল।
প্রসাদ পাইয়া সবে বৃন্দাবনে গেল।

—::—

২০ শে কার্ত্তিক ১৩৭১, ৫ ই নভেম্বর বুধবার

পঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা

ভক্তগণ সঙ্গে সবে বৃন্দাবন চলে।
মন্দিরে মন্দিরে গিয়া দেখিল গোপালে।
কেশীঘাটে স্নান কৈল পরম আনন্দে।
মঠেতে আসিয়া সবে গুরুদেবে বন্দে॥

—::—

২১ শে কার্ত্তিক ১৩৭১, ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার

—: শ্রীবর্ষাণা-শ্রীনন্দগাঁও পরিক্রমা :—

যাত্রিসহ গুরুদেব বাসেতে বসিয়া।
বর্ষাণে প্রবিষ্ট হৈল আনন্দিত হৈয়া॥
শ্রীজীকে দর্শন করি প্রেমাবিষ্ট হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল॥
অর্দ্ধবাহ্য হৈয়া কভু গড়াগড়ি যায়।
কভু উঠি নৃত্য করে উন্মত্তের প্রায়॥

ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাব দেহে প্রকাশয়ে।
তাঁহার হৃদয়-ভাব কেহ না জানয়ে॥
বৃষভানুরাজ আর কীর্ত্তিদা সুন্দরী
প্রণমি চলিল যথা নন্দরাজ পুরী।
পথে প্রেম সরোবর পরিক্রমা কৈল।
শ্রীসঙ্কেত লীলাস্থলে নৃত্য-গীত হৈল॥
নন্দীশ্বর গিয়া দেখে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
আনন্দেতে নৃত্য করে লৈয়া ভক্তগণ॥
শ্রীযশোদা নন্দরাজে তথায় দেখিল।
প্রেমাপ্লুত হয়ে তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল॥
পাবন সরসী আদি দর্শন করিয়া।
ফিরিল বৃন্দাবনে বাসেতে বসিয়া॥

২২ শে কার্ত্তিক ১৩৭১ ৭ই নভেম্বর শুক্রবার

—:শ্রীকাম্যবন পরিক্রমা:—

যাত্রিগণ কাম্যবনে চলে ভক্তসঙ্গে।
শ্রীবিমলাকুণ্ড আদি দেখে অতি রঙ্গে॥
কামেশ্বর শিব, পঞ্চপাণ্ডব দেখিল।
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ দর্শণ করিল॥
চরণ পাহাড়ে সবে উঠিল উল্লাসে।
কৃষ্ণ পদচিহ্ন দেখি হৃদয়ে পরশে॥
আনন্দেতে নৃত্য করে গায় কৃষ্ণ নাম।
তথা হৈতে চলে সবে বৃন্দাবন ধাম॥

—::—

২৩শে কার্তিক ১৩৭১, ৮ই নভেম্বর শনিবার শ্রীছত্রবন-খেলনবন-বিহারবন-ভদ্রবন"

:—পরিক্রমা:—

গুরুদেব অনুব্রজে চলে ভক্তগণ।
প্রবিষ্ট হইল 'ছাতা'—নাম ছত্রবন॥
রাখাল রাজা হইল—শ্রীকৃষ্ণ এখানে।
সিংহাসনে বসে, সেবে যত সখাগণে॥
মন্ত্রী তখন বলদেব হইলেন তাঁর।
শ্রীদাম ধরিল শিরে ছত্র চমৎকার॥
এই হেতু এথাকার নাম ছত্রবন।
গুরুদেব সহ এবে দণ্ডবৎ হন॥
তথা হৈতে গেল সবে শ্রীখেলন বন।
সখাসহ রামকৃষ্ণ (যথা) করেন ক্রীড়ন॥
কীর্ত্তন করিয়া গেল রামঘাট যথা।
প্রেমাপ্লুত গুরুদেব নৃত্য কৈল তথা॥
কি অদ্ভুত নৃত্য গীত হইল তথায়॥
প্রত্যক্ষ না কৈলে ইহা প্রতীত না হয়॥
হেথা বলদেব গোপী সহ দুইমাস।
বারুণী করিয়া পান কৈল মহারাস॥
যমুনারে ডাকে তেঁহো জলক্রীড়া তরে।
না গেল যমুনাদেবী উপেক্ষিল তারে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম আকর্ষিল হলে।
সভয়ে পড়িল দেবী রাম পদতলে॥

অদ্যাপি যমুনা তথা বক্রে প্রবাহিত।
গুরুদেব প্রণমিল হৈয়া হরষিত॥
প্রসাদ সেবিয়া চলে শ্রীবিহারবন।
গুরুদেব লীলাস্থলি দেখি তুষ্ট হন॥
তথা হৈতে চলে সবে শ্রীঅক্ষয়বট।
বিশ্রাম করিয়া সেথা গেল চিরঘাট॥
পরম নির্জ্জন কৃষ্ণলীলাস্থল।
প্রেমাবেশে গুরুদেব হইল বিহ্বল॥
ধামরাজে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।
নৃত্যগীতে ভক্তগণ পরানন্দ হইল॥
নন্দঘাটে উপনীত হইয়া সকলে।
শ্রীজীবে প্রণমি চলে যমুনার কূলে॥
স্নানান্তে পার হৈয়া গেল ভদ্রবন।
প্রসাদ সেবিয়া সবে চলে বৃন্দাবন॥
পথিমধ্যে বাসে মহা দুর্ঘটনা হৈল।
কৃপা করি ধামপ্রভু সবারে রক্ষিল॥

—•—

২৪শে কার্তিক ১৩৭১, ৯ই নভেম্বর রবিবার শ্রীরাভেল-ভাণ্ডীরবন-মাঠবন-বেলবন

—:পরিক্রমা:—

শ্রীমতীর জন্মস্থান রাভেল যাইয়া।
ভক্তসহ গুরুদেব নাচে হৃষ্ট হৈয়া॥

নাচিতে নাচিতে তেঁহো প্রেমাবিষ্ট হৈল।
শ্রীজীর প্রসাদী মালা পূজারী অর্পিল॥

শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিল সকলে।
মান সরোবরে চলে কৃষ্ণ কোলাহলে॥

এথা অভিমানে রাধা কাঁন্দি নিরন্তর।
চক্ষুজলে প্রকটিল মান সরোবর॥

রাই রাজা হয়ে এথা বসে সিংহাসনে।
সখিগণে সেবা করে পরম যতনে॥

তমাল শোভিত এই অতি রম্য স্থান।
দেখিয়া শ্রীগুরুদেব মহাতুষ্ট হন॥

নৃত্যগীতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা কৈল।
চিন্ময় সলিল স্পর্শে কৃতার্থ হইল॥

মাঠবনে দাউজীর আরতি দেখিয়া।
ভাণ্ডীরবনে গেল নৃসিংহ প্রণমিয়া॥

গোচারণে সখাগণে পিপাসার্ত্ত হৈল।
বেণু দ্বারে কৃপা করি কৃষ্ণ জল উঠাইল॥

সে জল পানে সবার তৃষ্ণা দূরে গেল।
সে হৈতে ইহার নাম বেণু কূপ হৈল॥

শ্রীরাধাগোবিন্দে সবে প্রণাম করিয়া।
বৃন্দাবনে যাত্রা কৈল অতি হৃষ্ট হৈয়া॥

—০—

২৫ শে কার্তিক ১৩৭১, ১০ই নভেম্বর সোমবার

—:শ্রীঅক্রুর ঘাট ও ভাতরোল দর্শনঃ—

পদব্রজে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া।
ভাতরোলে চলে গুরুদেবে অগ্রে নিয়া॥
গোচারণে গোপগণ ক্ষুধার্ত হইল।
কৃষ্ণের নির্দ্দেশে তারা দ্বিজগৃহে গেল॥
অঙ্গিরস যজ্ঞকরে স্বর্গ সুখকামে।
অন্ন নাহি দিল তারা কৃষ্ণ বলরামে॥
পুনঃ গেল দ্বিজপত্নীগণের সকাশে।
অন্ন লয়ে আসে তারা (দ্বিজপত্নীগণ) দর্শন লালসে॥
ভাত দিয়া রামকৃষ্ণে তথা তুষ্ট করে।
ভাতরোল নাম সবে সেই হৈতে ধরে॥
গুরুদেব নৃত্য করে সে স্মৃতি লইয়া।
ভক্তগণ নাচে গায় আনন্দিত হৈয়া॥
তথা হৈতে গেল সবে শ্রীঅক্রুর ঘাট।
প্রেমানন্দে ভক্তগণ-করে গীত নাট॥
এই স্থানে শ্রীঅক্রুর গেল স্নান তরে।
দেখিল শ্রীরাম-কৃষ্ণে জলের ভিতরে॥
বিস্ময়ে উঠিয়া দেখে রথে তারা আছে।
পুনঃ দেখে শেষশায়ী জলে বিরাজিছে॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এথা অক্রুর দেখিল।
এই হেতু "শ্রীঅক্রুরঘাট" নাম হৈল॥
গুরুদেব এই স্থানে দণ্ডবৎ করে।
নৃত্যগীতে মজে সবে আনন্দ সাগরে॥

দাবানল কুণ্ড পথে দেখি সর্বজনে।
নাচিতে নাচিতে সবে চলে বৃন্দাবনে॥

—•—

২৬শে কার্তিক ১৩৭১, ১১ই নভেম্বর মঙ্গলবার

—ঃপঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাঃ—

গুরুদেবে অগ্রে করি চলে ভক্তগণ।
পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় শ্রীবৃন্দাবন॥
শ্রীযুগল ঘাট হইতে চলে কেশীঘাট।
ধীর সমীরে চলে করি মহানাট॥
যমুনার তীরে তীরে কীর্ত্তন করিয়া।
চলিতে লাগিল সবে মহানন্দ হৈয়া॥
নিবিড় নিকুঞ্জ দেখে, দেখে শিখীগণ।
কৃষ্ণের বিহারস্থান করে নিরীক্ষণ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব নত হয়ে আছে।
ব্রজপতি কৃষ্ণ যেন প্রণাম করিছে॥
প্রভুলীলা উদ্দীপনে গুরুমহারাজ।
ভূমিতে লোটায় দেহ নাহি কোন লাজ॥
রমণরেতীতে আসি, লয়ে ভক্তগণ।
গুরুদেব আরম্ভিল মহাসংকীর্তন॥
বহুক্ষণ নৃত্যগীত হইল তথায়।
প্রেমাবেশে রেতীপরে গড়াগড়ি যায়॥
তাহা হৈতে চলিলেন কালিয়াদহেতে।
কালিয় দমন কৃষ্ণে পাইল দেখিতে॥

মহাক্রোধী কালিয়েরে শোধন করিয়া।
"ভৃত্যপদ" দিল কৃষ্ণ শিরে পদ দিয়া ॥
কালিয়েরে এই দহে করুণা করিল।
তে কারণে "কালিয়দহ" নাম হৈল ॥
নৃত্যগীত করি সবে চলে তথা হৈতে।
পুনঃ ফিরি আইলা শ্রীযুগল ঘাটেতে
মহা হরিধ্বনি করি, মঠে প্রবেশিল।
বৃন্দাবন পরিক্রমা সমাপ্ত হইল ।।

—•—

২৮ শে কার্তিক ১৩৭১, ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন দর্শন।

—ঃ জয়পুর যাত্রা ঃ—

ভক্তগণ সঙ্গে করি, প্রেমানন্দে বলি হরি
গুরুদেব চলে জয়পুরে
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, গৌড়ীয়ের প্রাণনাথ
দেখিবারে এআশা অন্তরে
তিনখানা বাসে বসি, ভরতপুরেতে আসি
গুরুদেব তথায় নামিল।
চারিজন ভক্তসনে, আরোহিয়া বাষ্পযানে
অপরাহ্নে জয়পুরে গেল ॥
তথাকার ভক্তগণে, আদর করিয়া তাঁরে
ধর্মশালায়-লইয়া চলিল ॥

জয়পুরে শোভা হেরি, শ্রীগোবিন্দ নাম স্মরি
গুরুদেব অতিতুষ্ট হৈল ॥

—৹—

২১শে কর্তিক, ১৩৭১, ১৪ ই নভেম্বর শনিবার—
—ঃশ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ আদি দর্শনঃ—

পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণ সঙ্গে চলে
রাধাগোপীনাথ দরশনে।
গুরুদেব প্রেমভরে, মহানন্দে নৃত্য করে
বাহু তুলি মন্দির প্রাঙ্গণে ॥
ভক্তগণ কুতুহলে, "জয় গোপীনাথ" বলে
উচ্চরবে করে সংকীর্তন।
পরম আনন্দভরে, উদ্দণ্ড নৃত্য করে
গোপীনাথ করেন দর্শন ॥
গোপীনাথ দরশনে, গুরুদেব তুষ্ট মনে
ভূতলে পড়িয়া নতি করে।
পুনঃ উঠি একদৃষ্টে, গোপীনাথে দেখে হৃষ্টে
অন্যদিকে দৃষ্টি নাহি ফেরে ॥
আরতি দর্শন কৈল, মহা-সংকীর্ত্তন হইল
শ্রীগোবিন্দ দর্শনে চলিল।
রাজপথ ধরি, ধরি, চলে সংকীর্ত্তন করি
গোবিন্দ মন্দিরে উপজিল
সহস্র দর্শকগণ, হৈয়া উৎকণ্ঠিত মন
বসি আছে শ্রীজগমোহন।

গুরুদেব সেই ক্ষণে যাত্রিসহ হৃষ্টমনে
প্রবেশিল গোবিন্দ অঙ্গনে ॥
মহাসংকীর্ত্তনরবে, পরিতুষ্ট কৈল সবে
গোবিন্দের আরতি দেখিল ॥
সর্ব্বজন মনলোভা গোবিন্দের রূপশোভা
গুরুদেবে বিমুগ্ধ করিল ॥
'শ্রীরূপের' প্রাণধন, গোবিন্দ বিগ্রহ হন
ব্রজে প্রকাশিয়া সেবা কৈল।
সুবৃহৎ মনোরম, শ্রীমন্দির অনুপম
নিরমিয়া গোবিন্দে স্থাপিল ॥
যবনাত্যাচার ভয়ে, সেবক "গোবিন্দ" লয়ে
জয়পুর রাজগৃহে আসে।
সেই হৈতে শ্রীগোবিন্দ, পরম আনন্দ-কন্দ
এথা হন সেবিত বিশেষে ॥

—০—

—ঃমনপ্রাণহরী শ্রীগোবিন্দের রূপ শোভাঃ—

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যাম, ঈষদ্ধাস্য মনোরম
বামাঞ্চলে বক্রদৃষ্টিযুক্ত
অধর পঙ্কজলোভে, সদালগ্ন বংশীশোভে
শিখিপুচ্ছ শিরে বিরাজিত ॥
বামে প্রিয়া শ্রীরাধিকা, সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা
তোষয়ে গোবিন্দ মন সদা।

এ রূপ দর্শন দানে, প্রেমে বাঁধে ভক্তজনে
মায়াসঙ্গ ছাড়ায় সর্ব্বথা ॥

—•—

সে রূপ মাধুরী হেরি, নয়নে বহয়ে বারি
গুরুদেব ভূমিতে লোটায়।
ক্ষণে উঠি ভক্তসঙ্গে, গীতবাদ্য নৃত্যরঙ্গে
পরিক্রমা আনন্দে করয় ॥
পূজারী প্রসাদ দিল, গুরুদেব প্রীতে নিল
জয় জয় "গোবিন্দ" বলিয়া।
প্রেমানন্দে ভক্তগণ, করে হরি-সংকীর্ত্তন
রাজপথে চলিল নাচিয়া ॥
শত শত নরনারী গুরুদেবে হর্ষে হেরি
পদরজ লইল লুটিয়া।
মহাভাগ্য সবে মানে, হেন ভক্ত পরশনে
অনুব্রজে চলিল ধাইয়া ॥

—•—

অপরাহ্নে ভক্তসনে, গুরুদেব হৃষ্টমনে
সংকীর্ত্তন করিয়া চলিল,
লোকনাথ প্রাণধন, "শ্রীরাধা বিনোদ" হন
প্রেমানন্দে দর্শন করিল ॥
শ্রীজীবের প্রাণেশ্বর, "শ্রীরাধা-শ্রীদামোদর"
দর্শন করিতে সবে চলে।
মত্ত হয়ে সংকীর্ত্তনে, প্রবেশিল শ্রীঅঙ্গনে
গগন ভেদিল কোলাহলে ॥

পরম আনন্দ করি, "রাধা দামোদর" হেরি
গুরুদেব প্রণাম করিল।
প্রসাদ আনি পূজারী, দিল অতি প্রীতিকরি
মহানন্দে লইয়া চলিল॥

—০—

৩০শে কার্তিক ১৩৭১, ১৫ ই নভেম্বর রবিবার—

যাত্রিগণ প্রাতঃকালে, করৌলি নগরে চলে
বাসে বসি কীর্ত্তন উল্লাসে।
"রাধা মদন মোহন," সনাতন প্রাণধন
মহানন্দ দর্শন লালসে॥
প্রবেশিয়া শ্রীমন্দিরে, আনন্দে দর্শন করে
সংকীর্ত্তনে নাচে ভক্তগণ।
প্রসাদ সেবন করি, উচ্চরবে বলি হরি
বাসে বসি ফেরে বৃন্দাবন॥
জয়পুরে চড়ি ট্রেনে, তিনটি সেবক সনে
গুরুদেব ভরতপুরে গেল।
যাত্রিসহ বাসে বসি, প্রেমরসার্ণবে ভাসি
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আইল॥
মঠে আসি ভক্তগণ, করে মহাসংকীর্ত্তন
গুরুদেব চরণ বন্দিল।
হরিধ্বনি করে সবে, মহানন্দ-অনুভবে
পরিক্রমা পরিপূর্ণ হৈল॥

—০—

শ্রীগৌর আগমনি স্তুতি ঃ—

এস গৌরাঙ্গ, এস নিত্যানন্দ
এস শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
এস গদাধর পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥
ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে
এস নদীয়া বিহারী।
সুরম্য মন্দিরে সিংহাসনোপরে
বস প্রভু কৃপা করি ॥ ২ ॥
ভকতবৎসল ভক্তের সম্বল,
এস ভক্তপ্রাণধন।
এস প্রেমদাতা সংকীর্ত্তন পিতা,
শ্রীহট্টবাসীর প্রাণ ॥ ৩ ॥
ভকত পালক, ভকত নায়ক
(এস) প্রেমের ঠাকুর গোরা।
তব আগমনে ভক্তগণ প্রাণে
বহিবে আনন্দধারা ॥ ৪ ॥

শ্রীশচীসুত গৌরহরির বন্দনা

রূপ বর্ণন ঃ—

কোটিচন্দ্র যিনি যার, বদন অতি সুন্দর
চাঁচর চিকুর কেশরাশি।
উজ্জ্বল তিলক ভালে বনমালা শোভে গলে
বদনে মধুর সদা হাসি ॥

আজানুলম্বিত যার, ভুজদ্বয় চমৎকার
সুবিশাল বক্ষ পরিসর।
ত্রিকচ্ছ বসনধারী, সংকীর্ত্তন পিতা হরি,
বন্দি সেই শচীসুতবর॥

গুণ বর্ণন :—

পতিতপাবন নাম, সর্বগুণগণ ধাম
সেবক বৎসল যেই জন।
আপনি আচরি ধর্ম, শিক্ষা দেয় শাস্ত্র মর্ম
দুর্জ্জনেরে করয়ে সজ্জন॥
কপটে কঠিন অতি, সরলে সদয় মতি
সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরয়।
ভক্তের গৌরবকারী, ভক্তপ্রাণ মনোহারী
বন্দি সেই শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম—

শিখিপুচ্ছ শোভে মুকুট উপরে,
তিলকাঙ্কিত কপালে।
চঞ্চল কুন্তল দোলায়ে মধুর
দিব্য শ্রবণ যুগলে॥
বামে বক্রদৃষ্টি, নাচয়ে ভ্রূযুগ
বদনে হাসি মধুর।
জিনি মুক্তাপাতি, দন্তবিরাজিত
উজ্জ্বল বিম্ব অধর॥
বনমালা দোলে গলদেশোপরে
ভৃগুপদ বক্ষে শোভে

অঙ্গে পীতবাস, মুখে মৃদুহাস
(সবে) আকর্ষে মুরলী রবে।
রুনুঝুনু বাজে, নূপুর মধুর
চরণ সুন্দর অতি,
হেন কৃষ্ণচন্দ্র ভকত সম্পদ
নিরন্তর করি নতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম—

হে কৃষ্ণ গোপাল, হে দীন দয়াল
শরণ লইনু আমি।
অতল অকূল দুঃখ সিন্ধু হতে,
তরাও আমারে স্বামী ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্বাচীন
কৃপাদৃষ্টে চাহ মোরে
করুণা করিয়ে রাখ নিজপদে,
হও চক্ষুর গোচরে ॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নাহি চাই
সব পার তুমি দিতে।
আমি চাই শুধু. তোমার মধুর
ব্রজরস আস্বাদিতে ॥
ভকতবৎসল, নাম শুনি তব
ভীত এ পতিত অতি।
দীননাথ নামে, ভরসা লভিল
তাই সদা করি নতি ॥

প্রাণপ্রিয় কানাইরে

ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে !
তুমি মোর প্রাণ, তুমি হে আপন,
তুমি মাত্র নাথ, মোর প্রয়োজন,
তুমি নিস্তারক, মোর মহাধন,
তুমি মোর গতি তুমিই পতিরে। ০
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ১ ॥
কিন্তু এবে হায়, ভুলিয়া তোমায়,
অসতে মজিয়া জীবন যে যায়
দয়া করি মোরে, চরণ ছায়ায়,
আশ্রয় প্রদান কর হে আমারে ॥ ০
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ২ ।
পুনঃ যদি পাই, তোমারে কানাই
বাঁধিব হৃদয়ে তোমারে জানাই,
ভুলিব না কভু সেবিব সদাই,
এমত বাসনা আছয়ে অন্তরে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৩ ॥
হৃদি বৃন্দাবনে, অপূর্ব্ব বিধানে,
সুরম্য মন্দির, কলা সুশোভনে,
নিরমান করি, অতি সুযতনে,
দিব্য সিংহাসনে বসাব তোমারে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৪ ॥
অশ্রু বারি দিয়ে, চরণ ধোয়ায়ে,
মন প্রাণ অর্ঘ্য, অর্পণ করিয়ে,

ভক্তিপুষ্প দ্বারে, চরণ সাজায়ে,
পীরিতি চন্দন পরাব তোমারে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৫ ॥

ভরিয়া পরাণ, সেবিব চরণ,
ভক্ত সনে হবে নর্ত্তন কীর্তন,
ডাকি উচ্চরবে, শ্রীরাধারমন”
ভাসিব সর্বদা আনন্দ সাগরে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৬ ॥

গুরুপদ দ্বন্দ্বে, গৌরাঙ্গ-গোবিন্দে,
পরম আদরে সেবিব আনন্দে,
রাধাভিন্ন গুরু, চরণারবিন্দে
সর্বস্ব অর্পিব তব প্রীতিতরে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৭ ॥

হৃদয়ে সবার, নির্ম্মিয়া মন্দির,
বসাবে তোমারে বাসনা গুরুর,
অণু-আনুকূল্য করিয়া তাঁহার
নিমজ্জিব কবে আনন্দ সাগরে।
ওহে মোর প্রাণপ্রিয় কানাইরে ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথ চরণে কৃপা প্রার্থনা—

ওহেঃ—

প্রাণের দেবতা, শুন মোর কথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কই।

তব অদর্শনে, কি কাজ জীবনে
বৃথাই যাতনা সই ॥ ১ ॥
অপরাধী বলে, আমারে ত্যজিলে,
মায়া দণ্ডে তাই অতি।
হে প্রভু দয়িত, কর মোর হিত
বার বার করি নতি ॥ ২ ॥
হা হা জগবন্ধু, করুণার সিন্ধু
আকর্ষহ কেশে ধরি।
তুমি মোর নাথ কর আত্মসাথ
না করিহ রোষ হরি ॥ ৩ ॥
হে রাধারমন, ভক্তপ্রাণধন
দয়া কর জগন্নাথ।
দেখা দিয়ে মোরে, বাঁধ স্নেহ ডোরে
রাখ সদা ভক্তসাথ ॥ ৪ ॥

প্রভু হে :—

তোমার চরণ, সুন্দর বদন
সুন্দর মধুর হাসি।
কবে বা হেরিব, কবে বা শুনিব
তোমার মোহন বাঁশি ॥ ৫ ॥
প্রসাদ সেবিব প্রপঞ্চ জিনিব
জড় রসে না ভাসিব।
পরশি শীতল অঙ্গ সুকোমল
(কবে বা) জীবন ধন্য মানিব ॥ ৬ ॥

তব অঙ্গগন্ধে, মাতিব আনন্দে
নাসিকা সফল হবে।
হেন ভাগ্য কবে, এ দীন লভিবে
তব কৃপা অনুভবে ॥ ৭ ॥

বার্দ্ধক্যে সকল ইন্দ্রিয় অচল
কিরূপে ভজিব বল।
এবে কৃপা করি, টানি লহ হরি
তব পদ সুসম্বল ॥ ৮ ॥

প্রাণের দেবতা, শুন মোর কথা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কই।
তব অদর্শনে, কি কাজ জীবনে, বৃথাই যাতনা সই ॥